দুলালী

(উপন্যাস)

"ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ"

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত

কলিকাতা,
৩৪।১ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী-ষ্টীম-মেশিন প্রেসে
শ্রীকেবলরাম চট্টোপাধ্যায় দ্বারা
মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১২৯৯ সাল।

"দুলালী" বড় বিষম উপন্যাস আর এই বিষম উপন্যাসে "ত্রিবক্র" বড় বিষম চরিত্র। ত্রিবক্র উৎকৃষ্ট নাটকের উপযোগী চরিত্র। এই চরিত্রের জন্য উপন্যাস-খানির বড়ই গৌরব হইয়াছে। চরিত্রটী আগাগোড়া সুরক্ষিত এবং নাটকের প্রণালীতে চিত্রিত হইয়াছে। উপন্যাসের উপসংহার ভাগ বড়ই ভীষণ—স্বয়ং ত্রিব-ক্রের ন্যায় ভীষণ। এবং এই ভীষণতায় বড় ভীষণ সৌন্দর্য্য সংসাধিত হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।—

২৫এ মাঘ, ১২৯১।

উৎসর্গ।

কবির সৃষ্টি, জগৎ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া, আমি মনে করি না। জগতের বুকে যে কথা লুকাইয়া আছে, হৃদয়ের ভাষায় তাহা পরিব্যক্ত করিয়া, কবি আপনার জগৎ সৃষ্টি করেন। সৌন্দর্য্যই জগতের প্রাণ;—সৌন্দর্য্য, কাব্যেরও প্রাণ। সুতরাং কবির প্রধান কাজ—সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি। প্রকৃতির ছায়া এই সৃষ্টিতে প্রতিফলিত হইয়া থাকে। কোমল ও কঠোর,—দুই লইয়াই প্রকৃতি। চিত্র অঙ্কিত করিতে যেমন আলোক ও ছায়ার প্রয়োজন, প্রকৃতির পূর্ণতার জন্য সেইরূপ কোমল ও কঠোর—দুয়েরই প্রয়োজন। এই দুয়ের সমাবেশ বড় গভীর ও রহস্যময়। এবং এই কোমল ও কঠোরের সমাবেশে, 'মানব-জীবনের মহা সমস্যা' 'ছক' এ মিলাইয়া, কবিকে একটি কৃত্রিম ও ক্ষুদ্র জগৎ সৃষ্টি করিতে হয়। সুতরাং কবির কাজ,—অতি উচ্চ ও অতি মহৎ।

বঙ্গ-সাহিত্যের গুরু হইয়া, এই উদ্দাম-ভাব, যিনি প্রত্যেক বঙ্গবাসীকে শিখাইয়া আসিতেছেন; সেই পরম পূজ্যপাদ

শ্রীযুক্ত বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

মহাশয়ের শ্রীচরণে;

এবং

যিনি সমালোচকের সিংহাসনে আসীন হইয়া, এই সৌন্দর্য্য-তত্ত্ব ও প্রকৃতি-রহস্য, বিশিষ্টরূপ অনুশীলন পূর্ব্বক, সাহিত্যামোদী ভাবুকবৃন্দকে বিতরিত করিতেছেন; যিনি পত্রে পত্রে—ছত্রে ছত্রে আমাকে বুঝিবেন

ও বুঝাইবেন,—সাহিত্যে ও সংসারে আমার সেই পরম-সহায়, বিশিষ্ট ভক্তিভাজন

শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ বসু

মহাশয়ের শ্রীচরণে,

প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে, এই গ্রন্থ উৎসর্গ করিলাম।

"দুলালী"র মূলমন্ত্র—

"ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মো রক্ষতি রক্ষিতঃ"।

বিষয় কঠিন,—উদ্দেশ্য সরল। যাহা তাঁহাদিগের নিকট শিখিয়াছি, তাহাই আজ তাঁহাদিগকে অর্পণ করিয়া কৃতার্থ ও ধন্য হইলাম।

"হেম্নঃ সংলক্ষ্যতে হগ্নৌ বিশুদ্ধিঃ শ্যামিকাপি বা"।

মজিলপুর,
২৪ পরগণা। } শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত দাসস্য।

দুলালী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

অষ্টাবক্র, বিরূপাক্ষ; মার্কণ্ডেয়, মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি কত 'কটমট' নাম তোমরা শুনিয়াছ; কিন্তু সৃষ্টি-ছাড়া, বেদ-পুরাণ-ছাড়া, 'ত্রিবক্র' নাম কখন শুনিয়াছ কি? নামটি যেমন উদ্ভট, এই অদ্ভুত-জীবের কার্য্যাবলীও তদ্রূপপ্রায়। সেই কথা বুঝাইবার জন্যই এই গৌর-চন্দ্রিকা।

রামপুর জেলার অন্তর্গত বাসন্তীপুর নামক গ্রাম। গ্রামখানির নাম-ডাক খুব। কায়স্থ-কুল-তিলক ত্রিবক্র সরকার এই গ্রামের একজন অধিবাসী। তাহার প্রকৃত নাম, ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ত্রিলোচন, ত্রিগুণাচরণ, বা তিতুরাম—এমনই কি-একটা নাম হইবে। কিন্তু গ্রামের লোকে তাহাকে 'ত্রিবক্র' নামেই সম্বোধন করিত। আমরাও এই উদ্ভট নামে, তাহাকে অভিহিত করিব।

এই নাম-বিশেষত্বের একটু কারণও আছে। ভালয় হউক—মন্দে হউক, ত্রিবক্র স্বনাম-পুরুষ,—সুতরাং ধন্য। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, ত্রিবক্রকে বিশেষরূপে চিনিত। কারণ, এই গুণধরের গুণ অশেষ।

সে সব গুণের কথা এখন থাক। এখন রূপের একটু বিশেষত্বের পরিচয় দিয়া রাখি। ত্রিবক্রের পৃষ্ঠদেশে একটি 'কুঁজ' আছে। এই কুঁজই তাহার কালস্বরূপ। সুতরাং ত্রিবক্রের অসাক্ষাতে, অনেকেই তাহাকে 'কুঁজো' বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। এই সুমিষ্ট-সম্বোধন-সংবাদে, তাহার অন্তরাত্মা যে কি করে, তাহা বলাই বাহুল্য। রূপে-গুণে, ত্রিবক্র, বিধাতার এক অদ্ভুত সৃষ্টি!

জগতের বৈষম্য, সে, আদৌ দেখিতে পারিত না। এজন্য "জগৎ-সংসারের উপর, সে, হাড়ে-হাড়ে চটা। রূপবান, রূপবান বলিয়া, ত্রিবক্র

তাহার উপর চটা।" বড়মানুষেরা, বড়মানুষ বলিয়া, ত্রিবক্র তাহাদের উপর চটা; আর সংসারের লোকের, কাহারও পিঠে কুঁজ নাই বলিয়া, ত্রিবক্র, সকল লোকের উপরই চটা।" এইটুকুই তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব।

ত্রিবক্রের বয়স অনুমান ৩৫।৩৬ বৎসর। এই সুদীর্ঘ কাল, পাড়ার দুষ্টলোকের দৌরাত্ম্যে, ত্রিবক্র, উত্তরীয় দ্বারা, এই কুঁজটি ঢাকিতে সততই সচেষ্ট। কিন্তু 'খোদার দাগা' কৃত্রিমতায় ঢাকা পড়ে না। একজন্য ত্রিবক্র বড়ই দুঃখিত। লাঠীগাছি লইয়া ত্রিবক্র যখন পথে বাহির হয়, তখন সে শ্রী-অঙ্গের শোভা, সম্যক্‌রূপ খুলিয়া থাকে।

ত্রিবক্রের স্বর এরূপ মধুর যে, দূর হইতে, ষাঁড়ের ডাক কি শকুনির ডাক,—কিছুই বুঝিবার যো নাই। বিশেষ, সেই খেঁকুর-কণ্ঠের হাসি ও কাসি এবং ক্রোধ ও খুসী, অনুধাবন করা বড় শক্ত-কথা। সে-এক বিটকেলতর বেজায় বে-আড়া-রকমের।

ভাঁড়ামীর ব্যবসায়ও ত্রিবক্রচন্দ্রের কতক ছিল। আবশ্যক হইলে, নানারূপ রঙ্গ দেখাইয়া, সং সাজিয়া, সকলকে হাসির তরঙ্গে মজাইয়া, রসিক-পুরুষ বিলক্ষণ আমোদ দিতেন। একে ত সেই শ্রীমূর্ত্তি—সহজেই দেখিলে হাসি পায়,—তদুপরি নানারূপ অস্বাভাবিক অঙ্গ ভঙ্গী করিয়া, মুখে 'হরবোলার' বোল আওড়াইয়া, সাক্ষাৎ 'কুজার পঞ্চরং' প্রদর্শন করিলে, কে না হাসিয়া থাকিতে পারে বল? আবশ্যক হইলে, লোকের চিত্ত-বিনোদন জন্য, বাহিরে সে এতটা ক্ষমতা ধরিত। কিন্তু অন্তরে?—অন্তরে সে, বিষ্‌-বিষে জ্বলিয়া মরিত,—দারুণ প্রতিহিংসা-পরায়ণ হইয়া, হৃদয়ে কালানল সঞ্চিত করিয়া রাখিত,—কিরূপে কোন্ সময়, সে, সেই রঙ্গ-দর্শকের সর্ব্বনাশ করিবে!

জীবটি এমন অদ্ভুত-ধাতুতে গঠিত। তোমার সাধ্য কি যে, তাহার মনের ভাব অবগত হইতে পার! যদি যায় উত্তরদিকে, বলে দক্ষিণ-দিকে। পৃথিবীতে সে, কাহাকেও বিশ্বাস করে না। কোন বিষয়ে, সে, সন্তুষ্টও নয়। সে, এত সন্দিগ্ধচিত্ত ও সদা-অসন্তুষ্ট যে, তাহার মুখখানা কখনও কূট-চিন্তা-রেখা-বর্জ্জিত থাকিত না!

বলিয়াছি ত, জগতের বৈষম্যের প্রতি, সে, হাড়ে-হাড়ে চটা।

হতভাগ্য দুর্দ্দমনীয় হিংসা-পরবশে, কেবলই মানুষের পার্থিব-অবস্থা ও সুখ-সম্পদ এবং নশ্বর-বস্তুরই বৈষম্য চিন্তা করিয়া থাকে। সে, মনে মনে কেবল এই কথাই ভাবে,—"আমি কেন এমন কুৎসিত ও কদাকার দেখিতে হইলাম? কি পাপে আমি কুঁজো হইয়াছি? সংসারে, আর এত মানুষ রহিয়াছে,—কৈ, কেহ ত আমার মত কুৎসিত দেখিতে নয়!—আমার মত, কাহারও পিঠে ত কুঁজ নাই। তার পর,—সকলের কেমন মান-সম্ভ্রম, সমাজে আদর-প্রতিপত্তি; আর আমাকে সম্মান-আদর করা দূরে থাক,—দেখিলেই সকলে হাসে, বিদ্রূপ করে, রঙ্গ-তামাসার সাধ মিটাইয়া লয়।"

হতভাগ্য কখন ভাবে,—"পয়সায় দেখ,—কেহ থাকেন দ্বিতল-ত্রিতল অট্টালিকায়, মেওয়া-মোণ্ডা-দুধ-ঘি খান, জুড়ী-গাড়ী হাঁকান,—আর আমি?—আমি তাহাদের তুলনায় কি সুখে আছি?—কষ্টে-সৃষ্টে কোন-রকমে দিন গুজরান করি মাত্র। বিশেষ, ঐ আমার বড় জ্বালা যে, আমাকে দেখিলেই সকলে হাসে,—ছেলেগুলা অবধি 'কুঁজো' বলিয়া ক্ষেপাইতে থাকে। উঃ! ইচ্ছা করে, এক-এক বেটাকে ধ'রে মুণ্ডুটা ছিঁড়ে ফেলি! আবার তাদের বাপ-মা-গুলাও কি কম পাজী! যদি সে ছেলে-বেটাদের কিছু বলি, ত, তারা কি কম লাঞ্ছনাটা দেয়! বলে কিনা,—'কুঁজোর অশেষ ভ্রুকুটী!' আরে কুঁজো,—তা তোদের কি! কি বলিব, খুন করিলে কোম্পানী ফাঁসি দেয়;—নহিলে দিন, দশ-বিশ-বেটাকে কুঁজো বলিবার সাধ মিটাইতাম! হায়, এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে? আমার এ জ্বালা কি কখন জুড়াইবে?"

নির্ব্বোধ কখন বা মনে করে,—"পোড়া লোকে এক উদ্ভট নাম বাহির করিল,—'ত্রিবক্র'! দেশ-বিদেশের সকল বেটাই অমনি সেই নামে ডাকিতে সুরু করিল। হায়, আমার দুঃখের কি শেষ আছে? আদালতে ত দেখ্‌ছি কথায়-কথায় মানহানির মোকদ্দমা উঠে,—চোরকে চোর বলা নিষেধ; মাতালকে মাতাল বলা আইন-বিরুদ্ধ; বেশ্যাকে বেশ্যা বলিলে দণ্ড পাইতে হয়;—কিন্তু আমি কেন তার সঙ্গে এই আইনটাও জারি হউক না;—'কাণাকে কাণা বলিতে পারিবে না; খোঁড়াকে খোঁড়া বলা নিষেধ; আর যার পিঠে একটু মাংসপিণ্ড আছে, তাকে

'কুঁজো' বলিয়া ক্ষেপাইলে কঠিন দণ্ড পাইতে হইবে!' হায়, তাহা হইবে কেন! পোড়া কোম্পানী কি তাহা করিবে? আমার কোনটা ভাল? যে দিকে দেখি, সেই দিকেই একটা-না-একটা খুঁৎ,—একটা-না-একটা অভাব বিদ্যমান।"

পাপিষ্ঠ কখন বা মনে করে,—"ভগবান্ কোথায়? এই কি তার ন্যায়-বিচার? আমি এমন কি গুরুতর অপরাধ করিয়াছিলাম যে, সকল রকমেই এত মনঃকষ্ট পাইতেছি। দূর হউক, আর ভাবিব না। ঈশ্বর কে? সে কি আছে? থাকিলে কি আমার এই দশা? আমি এতই কি পাপাচারী-দুরাচারী যে, যার জন্য আমায় এত মনঃকষ্ট পাইতে হইতেছে। না,—পাপ-পুণ্যই বা কি? আমি ও-সব কিছু বুঝি না। সে-কালের যত বুড়ো মুনি-ঋষিগুলো মিলে লোকের মনে একটা ধোঁকা দিয়া গিয়াছে। আমি কখনও ও-সব বিশ্বাস করি নাই, করিবও না। পাপ-পুণ্য যদি থাকিবে, তবে কি পাপে আমার এ মর্ম্মান্তিক দণ্ড হইল? কেন আমি কুঁজো হইলাম? কেন, আমি অধম, অন্যে উত্তম হইল? যাহা হউক, কাহারও-না-কাহারও উপর দিয়া, আমার প্রাণের এ দারুণ জালা জুড়াইব।"

পাপিষ্ঠ, মনে মনে আরও কতরূপ দুরভিসন্ধি করিত; কত-কি পাপ-চিন্তা অন্তরে স্থান দিত। ভাবিয়া ভাবিয়া, তাহার মুখে কালিমা পড়িয়াছে। হায়, সংসারে এমন কত শত ত্রিবক্র, এইরূপে, আপন জালে আপনি আবদ্ধ হইয়া, কালকূট সেবন করিতেছে, কে বলিবে!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বাসন্তীপুরে একঘর বড় জমিদার আছে। জমিদার বাবুর নাম—নরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র। মিত্র-বাবু খুব বিশিষ্ট লোক। তাঁহার জমিদারীর আয় বার্ষিক লক্ষ-টাকারও অধিক। তেজারতি, কোম্পানির কাগজ প্রভৃতিতেও প্রায় বিশ লক্ষ টাকা হইবে।

শ্রীমান্ নরেন্দ্রনারায়ণ, ধন-কুবেরের একমাত্র গুণধর পুত্র; বিপুল সম্পত্তির অধিপতি। তাঁহার পরলোকগত পিতা, গবর্ণমেণ্ট-কমিসির-

রেটের গোমস্তা ছিলেন। কমিসিয়রেটে, কোনরূপে একবার প্রবেশাধিকার পাইলে তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিনের মত অচলা হইয়া যায়। নরেন্দ্রনারায়ণের পিতারও তাহাই হইয়াছিল। অতঃপর, যথাসময়ে তিনি কর্ম্মস্থল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পাট ও লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। বিষয়-বুদ্ধি তাঁহার বিলক্ষণরূপই ছিল। সুতরাং এ ব্যবসায়েও তিনি, অতি অল্পদিনের মধ্যে, বিলক্ষণ লাভবান্ হইলেন। অতঃপর তিনি জমিদারী, তেজারতি, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া, পরলোকগত হন।

এখানে নরেন্দ্রের বাল্য-জীবনের দুই একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। যখন তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়, তখন তিনি অপ্রাপ্তবয়াঃ। স্থাবর-অস্থাবর সমুদয় ভূ-সম্পত্তি সুতরাং কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে আসিল। জমিদারশ্রেণীর অপ্রাপ্তবয়াঃ সন্তানগণের সুনীতি ও শিক্ষার জন্য, তৎকালে গবর্ণমেণ্টের "ওয়ার্ড ইনৃষ্টিটিউসন" নামে একটি বিদ্যালয় ছিল। কিছুদিন হইল, এই বিদ্যালয়টী উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আর বিলাস-প্রাণ জমিদার-পুত্রদিগের, সে কারা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

আমাদের শ্রীমান্ নরেন্দ্রনারায়ণ কিন্তু এ কারা-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পান নাই। কারণ, তাঁহাদের সময়েও এই পাপ বিদ্যালয়টি বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং, তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া, কিছুদিনের জন্য এই ওয়ার্ডে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা-পড়া যেমন-তেমন একপ্রকার শেষ হইল,—মা-সরস্বতীও অব্যাহতি পাইলেন।

সে সব কথা অনেক। তাহার সবিশেষ পরিচয় দিতে গেলে, একখানি ছোট-খাট মহাভারত হইয়া পড়ে। তবে এখানে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, এই ওয়ার্ডে, পঠদ্দশাতেই নরেন্দ্রের পরকাল নষ্ট হয়। যেখানে যত-অধিক নিয়ম-কানুন-কড়াকড়ি, সেইখানেই তত-অধিক বেয়াদবীর বাড়াবাড়ি। ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধায়কের গুরু-শাসন-ভর্ৎসনা সত্ত্বেও, দুর্দ্দান্ত ছাত্রগণ 'বধামির' একশেষ করিত। আমাদের শ্রীমান্ নরেন্দ্রনারায়ণ তাহার অগ্রণী। রাত্রে ভৃত্য-প্রহরীর চক্ষে ধুলি দিয়া, বিদ্যালয়-বাটীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া,—সময়-বিশেষে বা সেই ভৃত্য-

রেটের গোমস্তা ছিলেন। কমিসিয়রেটে, কোনরূপে একবার প্রবেশাধিকার পাইলে তাহার ভাগ্যলক্ষ্মী চিরদিনের মত অচলা হইয়া যায়। নরেন্দ্রনারায়ণের পিতারও তাহাই হইয়াছিল। অতঃপর, যথাসময়ে তিনি কর্ম্মস্থল হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া পাট ও লবণের ব্যবসায় আরম্ভ করিলেন। বিষয়-বুদ্ধি তাঁহার বিলক্ষণরূপই ছিল। সুতরাং এ ব্যবসায়েও তিনি, অতি অল্পদিনের মধ্যে, বিলক্ষণ লাভবান্ হইলেন। অতঃপর তিনি জমিদারী, তেজারতি, কোম্পানীর কাগজ প্রভৃতিতে প্রচুর অর্থ সঞ্চয় করিয়া, পরলোকগত হন.

এখানে নরেন্দ্রের বাল্য-জীবনের দুই একটি কথা বলা আবশ্যক হইতেছে। যখন তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়, তখন তিনি অপ্রাপ্তবয়াঃ। স্থাবর-অস্থাবর সমুদয় ভূ-সম্পত্তি সুতরাং কোর্ট-অব-ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধানে আসিল। জমিদারশ্রেণীর অপ্রাপ্তবয়াঃ সন্তানগণের সুনীতি ও শিক্ষার জন্য, তৎকালে গবর্ণমেণ্টের "ওয়ার্ড ইন্‌ষ্টিটিউসন" নামে একটি বিদ্যালয় ছিল। কিছুদিন হইল, এই বিদ্যালয়টী উঠিয়া গিয়াছে। এক্ষণে আর বিলাস-প্রাণ জমিদার-পুত্রদিগের, সে কারা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

আমাদের শ্রীমান্ নরেন্দ্রনারায়ণ কিন্তু এ কারা-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি পান নাই। কারণ, তাঁহাদের সময়েও এই পাপ বিদ্যালয়টি বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং, তাঁহার অনিচ্ছাসত্ত্বেও, তাঁহাকে বাধ্য হইয়া, কিছুদিনের জন্য এই ওয়ার্ডে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লেখা-পড়া যেমন-তেমন একপ্রকার শেষ হইল,—মা-সরস্বতীও অব্যাহতি পাইলেন।

সে সব কথা অনেক। তাহার সবিশেষ পরিচয় দিতে গেলে, একখানি ছোট-খাট মহাভারত হইয়া পড়ে। তবে এখানে এইটুকু বলা আবশ্যক যে, এই ওয়ার্ডে, পঠদ্দশাতেই নরেন্দ্রের পরকাল নষ্ট হয়। যেখানে যত-অধিক নিয়ম-কানুন-কড়াকড়ি, সেইখানেই তত-অধিক বেয়াদবীর বাড়াবাড়ি। ওয়ার্ডের তত্ত্বাবধায়কের গুরু-শাসন-ভর্ৎসনা সত্ত্বেও, দুর্দ্দান্ত ছাত্রগণ 'যথামির' একশেষ করিত। আমাদের শ্রীমান্ নরেন্দ্রনারায়ণ তাহার অগ্রণী। রাত্রে ভৃত্য-প্রহরীর চক্ষে ধূলি দিয়া, বিদ্যালয়-বাটীর প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়া,—সময়-বিশেষে বা সেই ভৃত্য-

প্রহরীর সাহায্যেই সব চলিত। টাকায় কি না হয়? সুতরাং বিলাস-তরঙ্গে অঙ্গ ভাসাইবার, বিশেষ প্রতিবন্ধক ঘটিত না,—আমোদ-প্রমোদ রঙ্গ-রস—সকল সাধই মিটিত। তাহাতেই বলিতেছিলাম, এই ওয়ার্ড হইতেই, নরেন্দ্রের প্রথম অধঃপতন আরম্ভ হয়।

যথাসময়ে তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, গভর্ণমেণ্ট হইতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করিলেন। সমস্ত বিষয়-আশয়, স্থাবর-অস্থাবর ভূ সম্পত্তি বুঝিয়া লইলেন। সংসারে তাঁহার জননী বর্ত্তমান। মাতা-পুত্রে পরামর্শ করিয়া, জমিদারী রক্ষার জন্য, তত্ত্বাবধায়ক, নায়েব, গোমস্তা, তহশীলদার প্রভৃতি লোকজন নিযুক্ত করিলেন।

মায়ের একমাত্র পুত্র,—স্নেহের নিধি, মাথার মণি,আদরের গোপাল—নরেন্দ্রনারায়ণ। সেই নরেন্দ্রই তাঁহার জীবনসর্ব্বস্ব। স্নেহের মূর্ত্তিমতী দেবী—জননী, পুত্র-স্নেহে আত্মহারা, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যা। তিনি নরেন্দ্রের কোন দোষই দেখিতে পান না, তাহার সবই ভালর চক্ষে দেখেন। অথবা ভালবাসাই অন্ধ, তাহার আবার বিচার-শক্তি কোথায়? মায়ের এরূপ অযথা—অতিরিক্ত স্নেহ পাইয়া, গুণধর পুত্রের অসাধারণ গুণাবলী উত্তরোত্তর বিকশিত হইতে লাগিল। তবে এখনও পূরামাত্রায় উঠে নাই, প্রকাশ্যে ততটা চলিত না। কিন্তু নরেন্দ্র যাহা করে বা করিতেছে, সবই ভালর জন্য, জননীর এইরূপ বিশ্বাস। "আহা বাছা আমার একটি বৈ নয়,—বেঁচে থাক্—সুখে থাক্, ওর যা ইচ্ছা হয় করুক; আমার এ ইন্দ্রপুরী, কিসের অভাব!" তিনি অনুক্ষণ এই ভাবিতেন। সুতরাং নরেন্দ্রের অধঃপতনের পথও সহজে পরিষ্কার হইতে লাগিল।

যথাসময়ে, মহা আড়ম্বরে, মায়ের মাথার-মণি নরেন্দ্রনারায়ণের শুভ-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। পুত্রের বিবাহে, মাতার আনন্দ অনির্ব্বচনীয়। মায়ের স্নেহ-স্রোত, শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। তিনি হরষিত মনে, পুত্রবধূকে গৃহে তুলিলেন। বধূর চাঁদপানা মুখ—প্রেমভরা হাসি দেখিয়া, ইহ-সংসার ভুলিয়া গেলেন। নরেন্দ্রও বেশ শ্রীমান্—সুতরাং সোণায় সোহাগা মিশিল। তাঁহার প্রাণাধিক জীবন সর্ব্বস্ব নরেন্দ্রের বধূকে তিনি কোলে লইয়াছেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর সুখ কি? "আহা, আজ যদি তিনি থাকিতেন, তাহাহইলে এইখানেই আমার স্বর্গবাস

হইত।” পতিহারা পতিব্রতা এই কথা ভাবিয়া, নীরবে, দুই ফোঁটা চক্ষের জল মুছিলেন।

দেখিতে দেখিতে চারি-পাঁচ বৎসর কাটিয়া গেল। নরেন্দ্রনারায়ণ ক্রমেই অধিকতর সুখের তরঙ্গ দেখিতে লাগিলেন। পুণ্যবতী জননীর, সে সকল বীভৎসময় দৃশ্য আর দেখিতে হইল না,—এই সময়ে তিনি অনন্ত-কালের জন্য, কালের কোলে অঙ্গ ঢালিয়া দিলেন।

নরেন্দ্রনারায়ণ এখন একক। সংসারে তাঁহার অভিভাবক আর কেহই রহিল না। যাই হউক, এক মা ছিলেন, সে অন্তরায়ও অন্তর্হিত হইল। তিনি এক্ষণে অন্তরঙ্গ ইয়ার-বন্ধু লইয়া, পূর্ণ স্ফূর্ত্তিতে, ‘সুখের পায়রার’ ন্যায় উড়িতে আরম্ভ করিলেন। সময় বুঝিয়া কোথা হইতে, তাঁহারই যোগ্য কি ততোধিক এক সহচর আসিয়া জুটিল। মজলিস আরও জমিয়া গেল। সুখের তরঙ্গ শতগুণে বর্দ্ধিত হইল। ক্রমেই সে সকল কথার আলোচনা করা যাইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

একদিন সন্ধ্যার পর, নরেন্দ্রনারায়ণ আপন বিলাস-কক্ষে বসিয়া আছেন, এমন সময় পঞ্চানন নামধারী জনৈক পারিষদ আসিয়া নিবেদন করিল,—“হুজুর, বড় একটা তোখড় লোক পাওয়া গিয়াছে। যদি অনুমতি করেন, তাকে হুজুরের কাছে নিয়ে আসি।”

নরেন্দ্র সাগ্রহে কহিলেন,—“কেরে পঞ্চানন?—কে সে লোকটা রে? আমার আসরের তোখড় লোক, এ বাসন্তাপুরে কে আছে রে?”

“আজ্ঞে, হাঁ হুজুর!—আছে একজন,—আছে।”

“কৈ, তুই এতদিন ত আমাকে বলিস নাই!”

“আজ্ঞে, সে লোকটা বড় অসভ্য; তাই—তাই”—

“আরে, হোক অসভ্য,—এ সকল কর্ম্মের কর্ম্মী কি না?”

“আজ্ঞে তায় খুব;—বরং কয়েক ডিগ্রী বেশী।”

“বটে! তবে আজই—এখন-ই তাকে নিয়ে আয়।”

“যে আজ্ঞা।”

"আচ্ছা, লোকটার নাম কি বল্ দেখি ?—কি জাত ?

"আজ্ঞে, তায় ভাল,—জাতিতে কায়স্থ ; তার নাম ত্রিবক্র সরকার।"

"ত্রিবক্র সরকার ! 'ত্রিবক্র' কিরে ?"

"আজ্ঞে, লোকটা দারুণ দুঁদে ; তাই গাঁয়ের লোকে, ওকে ঐ নামেই ডাকে।"

"বটে ! তা বেশ—বেশ। এক অষ্টাবক্র মুনির নামই শুনেছি ; ত্রিবক্র-নাম এই নূতন শুন্‌লেম। তবে বোধ হচ্ছে, লোকটা খুব বাঁকা। কেমন,—না ?"

"আজ্ঞে, বাঁকা কি সোজা, আপনি-ই বুঝে নেবেন।"

নরেন্দ্র, মুখে অঙ্গুলির অগ্রভাগ দিয়া, কি-একটু ভাবিয়া কহিলেন,—"ওঃ ! বটে বটে ; এতক্ষণে আমি লোকটাকে চিনেছি। সেই কুঁজো সং ত বটে ?"

"আজ্ঞে হাঁ।"

নরেন্দ্র ব্যগ্র ভাবে কহিতে লাগিলেন,—"আরে যা ! আমি এতদিন এ লোকটাকে ভুলে'ছিলেম। ওরে পাঁচু, তাকে পেলে যে, আমি এত-দিন, এ বাসন্তীপুর 'বৈতরণী নদী' ক'রে দিতেম রে ! হায় হায় !"

পঞ্চাননও অবসর বুঝিয়া কহিল,—"তা' এ জন্য আর হুজুরের এত আক্ষেপ কেন ? আমি এখনই তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে আস্‌ছি। হুজু-রের সভায় সে ভাঁড় থাক্'ব।"

'সে কথা মন্দ নয়। তা' তুই এখনই যা'।"

"যে আজ্ঞে"

পঞ্চানন দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। নরেন্দ্র, উদ্‌গ্রীব ভাবে, তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"আর আমার কা'কে ভয় ? এক মা ছিলেন, তিনি স্বর্গবাসী হয়েছেন ; তবে কাকে দেখেই বা চক্ষুলজ্জা করব ? আর এক প্রমদা ! (নরেন্দ্রের সহ-ধর্ম্মিণী)—তা—তা তাকে দুই ধমকে ঠিক রাখ্‌ব। এম্‌নে ত তার মুখে কথাটিও ফুটে না ; তার উপর লালজল পেটে পুরে, চক্ষু রক্তবর্ণ ক'রে দাঁড়ালে, সে, একেবারেই ঠাণ্ডা হ'বে। এখন একবার এই লোকটাকে পেলে হয়। ঠিক বটে,—ছেলেবেলায়, এই কুঁজোকে দু' একবার দেখেছিলাম।

দেওয়ালীতে বেটা সং দিত ভাল। তা' বেশ ; এখন থেকে আমার বিদূ-ষক হবে। এর দ্বারা একে একে, আমরা সকল সখ্ মিটাব।"

নরেন্দ্র এইরূপ বিলাস-চিন্তায় মগ্ন আছেন, এমন সময় পঞ্চানন, ত্রিবক্রকে সঙ্গে লইয়া, সেইখানে উপস্থিত হইল। ত্রিবক্রও সময় বুঝিয়া, নানারূপ অঙ্গ-ভঙ্গী সহকারে বাবুকে একটি নমস্কার করিয়া দাঁড়াইল। বাবুও, আহ্লাদে ডগমগ হইয়া, তাহাকে আপন পার্শ্বে বসাইলেন। হাসিতে হাসিতে কহিলেন,—"কেমন হে ত্রিবক্র, আমার কাছে চাকরি করিতে পারিবে ত ?"

ত্রিবক্রও, সময়োপযোগী কৃতজ্ঞতার সহিত, অতি শান্ত-শিষ্টটির মত, বিনীতভাবে কহিল,—"সে কথা আর পাপ-মুখে বলিব কেমন করিয়া ? কার্য্যকালে হুজুর দেখিয়া লইবেন।"

"ভাল, ভাল। তা এতদিন তুমি আমার কাছে এস নাই কেন ? তোমায় যে আমি এতদিন বড়মানুষ করিয়া দিতাম হে !"

"তা কি হুজুর, না ভাবিয়াছি ? কিন্তু হুজুরের সাক্ষাৎ পাওয়া ত কম পুণ্যের কথা নয় ! এতদিন বরাৎ ঢাকা ছিল, এইবার খুলিয়াছে।"

বস্তুতঃ, নরেন্দ্রনারায়ণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া, স্বহস্তে বিষয়াদি পাওয়া অবধি, ত্রিবক্রের একান্ত অভিলাষ ছিল, কোনরূপে তাঁহার সঙ্গলাভ করে। কিন্তু এতদিন এ সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। কারণ, নরেন্দ্র ধন-বান্, সৌখিন-বাবু,—আর ত্রিবক্র দরিদ্র, তাহার উপর আবার ঘোর অসভ্য বিশেষ, নরেন্দ্রের প্রাসাদ-ভবনের সম্মুখে, ফটক-দেউড়ীতে, যে সব লাল-পাগ্ড়ীওয়ালা, লাটী-ঘাড়ে রাম সিং পাঁড়ে, তুল্‌সী সিং চৌবে, প্রভৃতি পশ্চিমে-পালোয়ান অবস্থিতি করিত, তাহাদের ভয়ে, ত্রিবক্র দ্বারদেশ অতিক্রম করিতেই পারিত না,—বাবুর সাক্ষাৎ লাভ ত দূরের কথা। ত্রিবক্র, সময় অসময়, যখন-তখন, এই দোবে-চৌবের শরণাপন্ন হইত; কিন্তু তাহাদের সেই 'ছিদ্ধি ভিদ্ধিময়' সুমধুর বাক্‌সুধা পান করিয়া, দূর হইতে প্রণাম পূর্ব্বক, মনে মনে তাহাদের মুণ্ডপাত করিতে করিতে চলিয়া যাইত। বাবুর অন্যান্য পারিষদদিগকেও, ত্রিবক্র এজন্য অনেক অনুনয় বিনয় করিয়াছিল ; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। শেষে এই পঞ্চাননের পদপ্রান্তে শরণ লইয়া, সে বাবুর পারিষদদলভুক্ত হইল।

পঞ্চাননের এই সাধুকার্য্যে, অবশ্য কোন রকম একটা 'চুক্তি' হইয়া থাকিবে। তাহা কেবল মাত্র পঞ্চানন আর ত্রিবক্র জানে। ত্রিবক্র, বাবুর নিকট হইতে যাহা উপার্জ্জন করিবে, পঞ্চানন বিনা পরিশ্রমে তাহার চারি আনা 'বখরা' পাইবে। যাহা হউক, পঞ্চানন ত এই পরার্থপরতা-টুকু দেখাইল,—আর কাহারও দ্বারা ত এ শুভ কর্ম্মটি সম্পন্ন হইল না,—এজন্য ত্রিবক্র মনে মনে পঞ্চাননের নিকট কৃতজ্ঞ।

এতদিনে, সমানে সমান মিলিল; মণি-কাঞ্চনে যোগ হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অসাধারণ চতুরতাগুণে ও দুষ্টবুদ্ধির প্রভাবে, ত্রিবক্র অতি অল্পকালের মধ্যে, বাবুর বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিল। বস্তুতঃ, কি শুভক্ষণেই সে, নরেন্দ্রের সুনয়নে পড়িয়াছিল! নরেন্দ্রের প্রকৃতি বুঝিয়া, ত্রিবক্র, অনুক্ষণ তাহার মনস্তুষ্টি করিতে লাগিল। যাহাতে নরেন্দ্র সন্তুষ্ট থাকে, যাহাতে তাহার আমোদ হয় ও সখ মিটে,—এমনই সব কুৎসিত কার্য্যের অবতারণা করিয়া, ত্রিবক্র, নরেন্দ্রের মনের উপর প্রবল আধিপত্য স্থাপন করিল। পারিষদমণ্ডলীর মধ্যে, ত্রিবক্র এখন সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছে। অধিক কি, দেখিতে দেখিতে স্বয়ং নরেন্দ্রনারায়ণই ত্রিবক্রময় হইয়া পড়িল। ত্রিবক্র যাহা করিবে বা করিতেছে, তাহার উপর নরেন্দ্রের কথা কহিবার কিছুই নাই। ত্রিবক্র এখন নরেন্দ্রের সর্ব্বময় কর্ত্তা—নরেন্দ্র এখন তাহার যন্ত্র-পুত্তলি। ত্রিবক্র এখন নরেন্দ্রকে কলের পুতুলটির মত চালাইতে, ফিরাইতে, উঠাইতে, বসাইতে, নাচাইতে পারে।

ত্রিবক্রকে দেখিলে সকলেই হাসিত, সেও সকলকে হাসাইত; কিন্তু সে হাসির পরিণাম বড়ই ভয়ঙ্কর। সে, সকল বিষয়েই সকলের উপহাসাস্পদ বলিয়া, বড়ই ক্ষুব্ধ, বড়ই হিংসা-পরায়ণ, বড়ই পরশ্রীকাতর। এ চিন্তায় সে, অহর্নিশি মনে মনে পুড়িত, অথচ কোন প্রতিকার করিতে পারিত না। এতদিনে নরেন্দ্রের উপর দিয়া, ত্রিবক্র, সে মর্ম্মান্তিক জ্বালা জুড়াইতে কৃতসঙ্কল্প হইল।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জগৎ-সংসারের উপর ত্রিবক্র হাড়ে-হাড়ে চটা। সুতরাং, "সে জগৎ-সংসারের উপ' রাগ করিয়া, হতভাগ্য নরেন্দ্রকে ক্রমেই মহা পাপপথে লইয়া যাইতে লাগিল।" "কি করিলাম বা কি করিতেছি" বলিয়া নরেন্দ্রের একটু ভাবিবারও অংসর ত্রিবক্র দিত না। অহর্নিশি পাপপঙ্কে নিমগ্ন রাখিয়া, সে, নরেন্দ্রকে ক্রমে একটি মূর্ত্তিমান পাষণ্ড, পশু, পিশাচ করিয়া তুলিল

নরেন্দ্রের সাধ্য কি যে, দুর্ম্মতি ত্রিবক্রের কূটবুদ্ধি ভেদ করে। নরেন্দ্র মনে মনে এই ভাবিত,—"ত্রিবক্রের ন্যায় আমার এমন সুহৃদ্ আর কে আছে? উপযাচক হইয়া, কে আর আমার সুখের পথ প্রসারিত করে? ধন্য ত্রিবক্র! তোমার কাছে আমি আর কি কৃতজ্ঞতা দেখাইব,—আমার অতুল ঐশ্বর্য্য, ধন, রত্ন, মান, সম্ভ্রম—এমন কি আমার জীবন্ অবধি তোমাকে সমর্পণ করিলাম; তুমি, যাহা ইচ্ছা হয়, কর।" প্রলুব্ধ, মোহান্ধ-যুবা, এখন এই ভাবে, ত্রিবক্রকে দেখিতে লাগিল। পাপিষ্ঠ ত্রিবক্রও সময় বুঝিয়া, আপন 'কল-কাটী' নাড়িতে লাগিল। "সে, নরেন্দ্রকে ভাল-মন্দ কিছুই জানিতে দেয় না, তাহাকে অত্যাচারে উত্তেজিত করে, পাপকর্ম্মে বিশেষরূপে প্রশ্রয় দেয়। বড় বড় সম্ভ্রান্ত-পরিবার মধ্যে, কোন্ কুলবধূকে কলঙ্কিনী করিতে হইবে, কাহার ভগিনীকে অভাগিনী করিতে হইবে, কাহার সহধর্ম্মিণী বা দুহিতাকে ধর্ম্মচ্যুতা করিতে হইবে, ত্রিবক্র, নরেন্দ্রকে তাহারই শিক্ষা দেয়, নরেন্দ্রের স্বেচ্ছাচারের সুযোগ নিয়তই জুটাইয়া দিয়া থাকে।" ইহাই তাহার একমাত্র কার্য্য। পাপ-পথ-যাত্রী প্রলুব্ধ-বিলাসীর সহিত মহাপাপীর সম্মিলনে, যাহা ঘটিতে পারে, তাহার চূড়ান্ত অভিনয় চলিতে লাগিল।

বিশেষ, টাকার জোরে কি না হয়? নরেন্দ্র বিপুল ধনের অধিপতি,—তাহার সাধ অপূর্ণ থাকিবে কেন? অর্থের বশ সকলেই। সেই ক্ষুদ্র গোলাকার—অদ্ভুত-ধাতু নির্ম্মিত, অমল-ধবল-উজ্জ্বল-কান্তি-বিশিষ্ট, প্রাণ-মনঃ-শ্রবণ-বিমোহন মধুরনাদী দুর্লভ-পদার্থের প্রলোভন ত্যাগ করা বড় শক্ত কথা। গ্রামের যাঁহারা একটু 'মাতব্বর' লোক, পাপিষ্ঠ ত্রিবক্রের পরামর্শে, নরেন্দ্র, তাঁহাদিগকে এই রৌপ্যখণ্ড

দ্বারা বশীভূত করিল। সুতরাং অক্ষম-প্রতিবাসীবর্গের সমূহ বিপদ উপস্থিত হইল। অমুকের জায়া-দুহিতা-ভগিনীর সতীত্বনাশের উপক্রম হইয়াছে, কোন অভাগীর কপাল বা জন্মের-মত পুড়িয়াছে,—ক্ষমতাপন্ন প্রতিবাসী, এ সকল অত্যাচার দেখিয়াও দেখিতেছে না। স্বার্থের মোহে তাহাদের মনুষ্যত্ব লোপ পাইয়াছে।

অর্থে ও মনুষ্যত্বে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। কাল-মাহাত্ম্যে, বুঝি, এ দুই বস্তু একত্র থাকিতেই পারে না। রৌপ্যখণ্ড! তুমি থাক একদিকে, আর মনুষ্যত্ব থাক্ একদিকে,—মনুষ্যত্বের সাধ্য কি যে, তোমার স্থান অধিকার করিতে পারে! তুমি ও মনুষ্যত্ব একস্থানে অবস্থিতি কর,—হে অর্থ! তোমার মাহাত্ম্যই বৃদ্ধি পাইবে! শত সহস্র লোক তোমার অনুসরণ করিবে! লক্ষের মধ্যে, ৯৯ হাজার, ৯ শত, ৯৯ জন তোমার শিষ্যত্ব লাভ করিবার জন্য ছুটিতে থাকিবে! রৌপ্যখণ্ড! তুমি থাক একদিকে, আর একদিকে দয়া, ধর্ম্ম, প্রেম, প্রীতি, প্রণয়, ভালবাসা—সমুদয় সদ্বৃত্তি রাখিয়া 'ওজন' করা যাক্,—নিশ্চয়ই তোমার দিকটা ভারি হইবে। তোমার মাহাত্ম্য অনন্ত—অসীম! তাই, ভাগ্যহীন-প্রতিবাসীর জাতি-কুল-মান বাঁচাইতে, ভাগ্যবন্ত প্রতিবাসী অগ্রসর হইল না! অক্ষমকে বাঁচাইতে, ক্ষমবান্ নিশ্চেষ্ট—উদাসীন রহিল। অধিকন্তু, কেহ কেহ অত্যাচারীর সাহায্যকারী হইয়া, দ্বিগুণবেগে আগুন জ্বালিয়া দিল! ইহারই নাম সংসার!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে, একেবারে চারিদিকেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। পাপিষ্ঠ ত্রিবক্রের পরামর্শ-পরিচালনে, নরেন্দ্র এখন ঘোর অত্যাচারী হইয়া উঠিয়াছে। সকল কার্য্যে, সকলের সহিতই, সে, নৃশংস দস্যুর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিল। প্রজাপীড়নের আর অবধি রহিল না। অধিকন্তু, তাহাদের স্ত্রী-কন্যা-পুত্রবধূ লইয়া বাস করা, দায় হইয়া উঠিল। নিরর্থক দাঙ্গাহাঙ্গামা ও মামলা-মোকদ্দমায়, তাহারা ধনে-প্রাণে মারা পড়িল। তদুপরি জমিদার বাবুর আদেশ মত, কর্ম্মচারীগণ জমির হার

গড়ে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়া দিল। যে, ইহাতে স্বীকৃত না হইবে, তাহার ঘর-দ্বারে আগুন দিবার ব্যবস্থাও স্থিরীকৃত হইল।

ক্রমেই বাসন্তীপুর ছারখার যাইতে বসিল। সতীর সতীত্বনাশ, বংশের মর্য্যাদাহানি, জাতি-কুল-ক্ষয়ে সকলেই ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিল। দরিদ্র গৃহস্থগণ সদাই সশঙ্কিত,—কখন কি বিষম অনর্থ উপস্থিত হয়। এই জন্য, অনেকে, 'বাস্তু-ভিটা' পরিত্যাগ করিয়া, গ্রামান্তরে, আশ্রয় লইল। কেহ কেহ বা গুপ্তভাবে, ঘর-দ্বার ছাড়িয়া, গভীর নিশীথে, দেশ-দেশান্তরে পলায়ন করিল। দরিদ্র কৃষক, তাহার শস্যপূর্ণ-শ্যামল-ক্ষেত্র, ফল-মূল-বৃক্ষ পূর্ণ সোণার বাগান, বাষ্পপূর্ণ নেত্রে, জন্মের মত দেখিতে দেখিতে, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাগণকে লইয়া, নগরান্তরে অন্য জমিদারের শরণাপন্ন হইল। তাহাদের কুটীর শূন্য,—ধান্যগোলাগুলি শূন্য পড়িয়া রহিল। তাহাতে এক একবার প্রবল বায়ু প্রবেশ করিয়া, ভীতিপূর্ণ বিকট 'হো হো' শব্দ করিতে লাগিল। ভয়ার্ত্ত-পথিক প্রেতযোনির আশঙ্কায়, সে পথ পরিত্যাগ করিল। সুতরাং সে সকল স্থান, ক্রমে নিবিড় জঙ্গলময় হইয়া উঠিল। এইরূপে, সোণার বাসন্তীপুর, শ্মশানে পরিণত হইতে চলিল।

নরেন্দ্র বিপুল ধনের অধীশ্বর,—একজন সমৃদ্ধিশালী জমিদার;—তাঁহার বিরুদ্ধে কে দাঁড়াইবে? আর, দাঁড়াইলেই বা ক্ষতি কি? আদালত বল, কোর্ট বল,—অর্থের বশীভূত-লোক নাই কোথায়? সুতরাং কাহারও দ্বারা কিছু হইবার নহে। স্থানীয় দারোগা-সাহেব—সব-ইন্‌স্পেক্টার বাবু ত নরেন্দ্রের হাত-ধরা। তাঁহারা মধ্যে মধ্যে নরেন্দ্রের বিলাস-কক্ষে আসিয়া প্রসাদ পাইতেন। প্রসাদের উপর আবার রূপার চাকৃতি!—মণি-কাঞ্চন-যোগ! সুতরাং নরেন্দ্রের চারিদিকই ফর্‌সা। তাঁহার যথেচ্ছাচারের পথ সম্পূর্ণ পরিষ্কার।

এই সময়ে আবার গভর্ণমেণ্ট, তাঁহাকে "রাজা বাহাদুর" উপাধি প্রদান করিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রতাপ আরও বৃদ্ধি হইল। ইতিপূর্ব্বে নিশ্চিন্তপুর পরগণায়, সাধারণের উপকারার্থ, লক্ষ টাকা ব্যয়ে, তিনি একটি লৌহ-সেতু নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ সৎকার্য্যে অনুরাগ দেখিয়া, গভর্ণমেণ্টও তাঁহাকে, রাজ-সম্মানে সম্মানিত করিলেন।

তাঁহার অভিনন্দন-পত্র এই মর্ম্মে লিখিত হইয়াছিল ;—"রামপুর জেলার অন্তর্গত বাসন্তীপুরের জমিদার, শ্রীল শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, অতি সচ্চরিত্র, পরোপকারী, দানশীল, রাজভক্ত ও একান্ত প্রজা-বৎসল। তাঁহার, অল্প বয়সে এত সদ্‌গুণের পরিচয় পাইয়া, গভর্ণমেণ্ট, তাঁহাকে এই রাজ-সম্মান প্রদান করিতেছেন। ভরসা করি, তিনিও, সানন্দে, এই মূল্যবান্ উপহার গ্রহণ করিয়া, সুস্থ শরীরে, দীর্ঘ জীবনলাভ করিবেন।"

সুতরাং, এখন বাবু নরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র, 'রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ মিত্র-বাহাদুর' নামে অভিহিত হইলেন। ওয়ার্ডে অবস্থান করিবার সময় হইতেই, তাঁহার এই 'রাজ-উপাধি' লাভের ইচ্ছাটা বলবতী হয়। তাঁহার মনে হইত,—"বাবা ত প্রবল প্রতাপান্বিত জমিদার নামে অভিহিত হইয়া গিয়াছেন-ই,—আমি তাঁর উপযুক্ত পুত্র,—আমিও কি আবার সেই 'জমিদার বাবু' নামে সাধারণ্যে পরিচিত হইব? তিনি তবে আমার জন্য এত বিষয় রাখিয়া গিয়াছেন কিজন্য? দেখিতেছি ত, কিছু টাকা খরচ করিলেই 'রাজা' 'রায় বাহাদুর' 'খেতাব' পাওয়া যায়। আমরাই বা টাকার অভাব কি? তবে আমি ইহাতে বঞ্চিত হই কেন?"

এই 'রাজা-বাহাদুর' উপাধি লাভ করিবার আরও একটু ইতিহাস আছে। বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া নরেন্দ্র, তাঁহার ওয়ার্ডের কোন বন্ধুর পরামর্শে কলিকাতার চৌরঙ্গীতে, একখানি বড় বাড়ী ভাড়া লইলেন। এবং তথায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া, নাম-জাদা বড় বড় সাহেব-সুবো ও বাবু ভাইদিগকে ভোজ দিতে লাগিলেন। ইহার সঙ্গে, গভর্ণমেণ্ট-সম্মানিত দুই একখানি ইংরাজী সংবাদ-পত্রের সম্পাদককেও মধ্যে মধ্যে নিমন্ত্রণ করিতে হইত। সম্পাদকগণও গোপনে, সে নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতেন। তাঁহাদের প্রস্থানকালীন, নরেন্দ্রকে পিতৃশ্রাদ্ধস্বরূপ, কিছু কিছু বিদায়-দক্ষিণা দিতে হইত। তাহা না হইলে, শ্রাদ্ধ মঞ্জুরই হইত না।

সম্পাদকগণও সত্যের দাস। তাঁহারা সেই সত্যপালনার্থ, ছন্দে-বন্দে-মহানন্দে, যখন তখন, নরেন্দ্রনারায়ণের যশোগান করিতে লাগিলেন ;—'এমন লোক আর হয় নাই, হইবে না ; এমন যোগ্য-ব্যক্তিকে, গভর্ণমেণ্টের অবশ্যই 'রাজা-বাহাদুর' উপাধি প্রদান করা উচিত।'

ইত্যাদি। কখন সম্পাদকীয় স্তম্ভে, কখন সুদীর্ঘ প্রবন্ধাকারে, কখন বা নাম-ধামহীন॥ উদ্ভট-উপাধিযুক্ত প্রেরিত-পত্রে, সে যশোগীতির সুর-তান-লয় ছুটিতে লাগিল।

অমনি অনাহূত পেটেণ্ট-ঔষধওয়ালা, সুবাসিত সৌখীন গোলাপী-নারিকেল-তৈলওয়ালা, রাবিশ-পুস্তকওয়ালা, নগণ্য ও নব-প্রকাশিত-মাসিক সাপ্তাহিক কাগজওয়ালা,—নাম ঠিকানার গন্ধ পাইয়া, নরেন্দ্রের নামে লাখে লাখে—ঝাঁকে-ঝাঁকে ঔষধ, তৈল,পুস্তক, পত্রিকা ও অনুষ্ঠান-পত্র সকল পাঠাইতে লাগিল। প্রাগুক্ত জিনিসের একজন বিশিষ্ট গ্রাহক হইতে, অধিক পরিমাণে ক্রয় করিতে, অধিকন্তু 'পেট্রণ' হইয়া উৎসাহ দিতে, নরেন্দ্রনারায়ণ বিশেষরূপে অনুরুদ্ধ হইতে লাগিলেন। ইহা ব্যতীত, 'ভারত-উদ্ধার' সভার সম্পাদক, 'বিশ্ব সুহৃদ্-সমিতির' অধ্যক্ষ, ও পবলিক লাইব্রেরী সমূহের বেকার সভ্যগণও নরেন্দ্রনারায়ণের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে ত্রুটী করিলেন না। নরেন্দ্রও নব-অনুরাগে সখের ভিক্ষুকদলকে, একেবারে বঞ্চিত না করিয়া, "যৎকিঞ্চিৎ" ভিক্ষা দিতে লাগিলেন।

এই রকম পাঁচটা কারণে, নরেন্দ্রের নাম, দেশ-বিদেশ 'জাহির' হইল। শেষ খোদ্ কোম্পানীর কৃপা-দৃষ্টিও নরেন্দ্রের উপর পড়িল। সুতরাং তাঁহার 'রাজা-বাহাদুর' 'খেতাব' লাভ করিতে, অধিক প্রয়াস পাইতে হইল না।

নরেন্দ্রের এই রাজসম্মান লাভের মঙ্গলাচরণস্বরূপ, এক মহা-মহোৎ-সব হয়। তাহাতে দেশ-দেশান্তর হইতে অনেক দীন দুঃখী, অনাথ আতুর সমাগত হইয়াছিল বটে; কিন্তু তাহাদের ভাগ্যে যণ্ডা-গুণ্ডা দোবে-চোবে প্রভৃতি 'অকালকুষ্মাণ্ড'গণের অর্দ্ধচন্দ্র মাত্র সার হইয়াছিল। তবে সাহেব-বাবুদলের ভোজে, নর্ত্তকী-বাইজীদের নাচ গানে, আর বিলাতী লালজলপূর্ণ বোতলের শ্রাদ্ধে, সপ্তাহকাল বাসন্তীপুর তোলপাড় হইয়াছিল,—ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে এ কথা লিখিতেছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

'রাজা-বাহাদুর' উপাধি লাভ করিয়া, নরেন্দ্রের পাপ-প্রতাপ আরও বৃদ্ধি পাইল পাপিষ্ঠ ত্রিবক্রও সময় বুঝিয়া, নিত্য-নূতন নরকের সৃষ্টি করিতে লাগিল। বাসন্তীপুর ও তন্নিকটস্থ গ্রামসমূহ 'থরহরি' কাঁপিতে লাগিল। ত্রিবক্রের সহবাসে থাকিয়া, নরেন্দ্র এখন যেরূপ কুৎসিত আমোদপ্রিয় হইয়াছে, পাঠক, তাহার দুই একটা পরিচয় গ্রহণ করুন। প্রধানতঃ নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারী ও মো-সাহেব-পারিষদবৃন্দকে লইয়া, নরেন্দ্রের এই সখ মিটিয়া থাকে। তাহার একটু আভাষ মাত্র দিতেছি।

কোন ভৃত্য পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া অঘোর নিদ্রায় অভিভূত আছে,—এই অবসরে নরেন্দ্র ও ত্রিবক্র তথায় উপস্থিত হইয়া, তাহার একদিকের গোঁফ, ভ্রূ, মাথার অর্দ্ধেক চুল উত্তমরূপে কামাইয়া দিল। অতঃপর সিন্দুর, কালী, হরিতাল প্রভৃতি রঙ্গের দ্বারা, তাহার সমস্ত মুখখানি চিত্রিত করিয়া, উভয়ে স্মিতমুখে প্রস্থান করিল।

যথাসময়ে, ভৃত্যের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ত্রিবক্র সময় বুঝিয়া, তাহাকে আহ্বান করিল। নরেন্দ্র পারিষদমণ্ডলী লইয়া, বৈঠকখানা গৃহে বিরাজমান,—পার্শ্বে ত্রিবক্র অবস্থিত। ভৃত্য, তথায় উপস্থিত হইবামাত্র, সকলে হো হো হাসিয়া উঠিল। ইহাতে 'গোবর-গণেশ' প্রভুর বড় আনন্দ। হাসিতে হাসিতে কহিল,—"কি রে বেটা রামা,—তোর মুখে এ সব কি?"

ভৃত্য, বিস্মিতভাবে কহিল,—"আজ্ঞে, কৈ?"

এই বলিয়া একবার মুখে হাত দিল। এই অবসরে, ত্রিবক্র একখানি দর্পণ আনিয়া, তাহার মুখের কাছে ধরিল। কহিল,—"দেখ্ দেখি, মুখখানি কেমন মানিয়েছে!"

ভৃত্য ত দেখিয়া অবাক্। ঈষৎ কান্নার সুরে, ক্ষুণ্ণভাবে কহিল,—"আজ্ঞে—এ—"

ত্রিবক্রও মুখ বিকৃত করিয়া, তাহার স্বাভাবিক কর্কশ-ব্যঙ্গস্বরে কহিল,—"আরে বেটা, আজ্ঞে ব'লে নাকে কাঁদিস কেন? তুই দেখ্ছি, এবার নিশ্চয়ই দেওয়ালীতে সং দিবি! কেমন, না?"

ভৃত্য, সেইরূপ ক্ষুণ্ণভাবে, কান্নার সুরে কহিল,—"আজ্ঞে, আপনাদের

কি, চাকর-নফর নিয়ে, এ রকম আমোদ করা ভাল দেখায়? দেখুন দেখি, এখনি আমাকে মাথা মুড়িয়ে, আবার সব কামাতে হ'বে।"

তারপর, নরেন্দ্রের প্রতি কিছু অভিমানস্বরে কহিল,—"হুজুর, তবে আমাকে জবাব দিন।"

এই বলিয়া কান্নার সুর একটু অধিক মাত্রায় চড়াইল।

ত্রিবক্র আবার ব্যঙ্গচ্ছলে কহিল,—"তা বেশ ত ব্যাটা, আমরা সবাইকে বল্‌ব, তুই প্রয়াগে গিয়েছিলি।"

ভৃত্য কিন্তু ইহাতে প্রবোধ মানিল না; সে, আরও কাঁদিতে লাগিল। পুনরায় নরেন্দ্রকে কহিল,—"তবে হুজুর, আমায় জবাব দিন।"

গোবরগণেশ প্রভু হাসিতে হাসিতে কহিল,—"আরে বেটা, যাবি কোথা? যা,—দেওয়ানকে ব'লে পাঠাচ্ছি,—পঞ্চাশ টাকা বখসিস পাবি।"

যাঁ করিয়া পঞ্চাশ পঞ্চাশ টাকা পুরস্কার পাইল দেখিয়া, ত্রিবক্র, মনে মনে হিংসায় জ্বলিতে লাগিল। কিন্তু এ হুকুম রদ করিলে, নরেন্দ্রের অপমান হয়, এজন্য কিছু করিতে পারিল না। তবে প্রকাশ্যে, ভৃত্যকে কহিল —"যা বেটা, তোর বরাৎ খুব ভাল। একটুখানি কেঁদে পঞ্চাশ পঞ্চাশ টাকা পেয়ে গেলি। কিন্তু দেখ্, তুই ঠিক ঐ রকম কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে, একপায়ে একটু নেচে যা।"

ভৃত্য, কি করে,—একদিকে এতগুলি টাকা,—অন্যদিকে দুঃখের উপর ভাঁড়ামী! কি করিবে, টাকার মায়া ত্যাগ করিতে না পারিয়া, ত্রিবক্রের আদেশই পালন করিল। সে দৃশ্য বড় সুন্দর। তাহার চক্ষে জল, অথচ অধরোষ্ঠে ঈষৎ হাসি।

কোন দিন বা কোন ভৃত্য, তামাক সাজিয়া, প্রভুর 'আলবোলায়' দিয়া যাইতেছে,—নরেন্দ্র সপারিষদবর্গ বসিয়া আছে,—হঠাৎ কি 'খেয়াল' উঠিল,—ত্রস্তভাবে ভৃত্যকে কহিল,—"ওরে, দেখ্ দেখ্,—তুই হাঁ কর্ দেখি,—তোর গালে ওটা কি দেখি।" এই কথা শুনিয়া, ভৃত্য চকিতের ন্যায়, যেমন মুখ-ব্যাদান করিল,—পিশাচ-প্রভু অমনি তাহার মুখের ভিতর একটা মাকড়সা পুরিয়া দিল। ভৃত্য, কাঁদিতে আরম্ভ করিলে, হয়ত, তাহাকেও ঐরূপ পুরস্কারের ব্যবস্থা করিল।

কোন দিন বা নরেন্দ্র, জনেক কর্ম্মচারীকে নির্দ্দেশ করিয়া, জমিদারী-

সংক্রান্ত একটা হিসাব দেখিবার অছিলায়, আহ্বান করিল। কর্ম্মচারীও ত্রস্তভাবে, কাগজ-পত্র লইয়া, তথায় উপস্থিত হইল।

কিন্তু ত্রিবক্রের পরামর্শমত, পূর্ব্ব হইতেই, একপাত্র 'চুন-হলুদ' সংগৃহীত হইয়া আছে। বৃদ্ধ কর্ম্মচারী, প্রভুর সম্মুখীন হইবামাত্র, নরেন্দ্র, তাহার সর্ব্বাঙ্গে, সেই তরল পদার্থটুকু ঢালিয়া দিল। সপ্রভু পারিষদবর্গ অমনি হো হো হাসিয়া উঠিল।

"একি হুজুর, কি করিলেন?" বলিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, ঈষৎ ক্ষুব্ধ অথচ লজ্জিতভাবে, গাত্র বস্ত্রগুলির জলসেক করিতে লাগিল। নির্লজ্জ প্রভু কহিল,—"না, এমন কিছু নয়, —এই একটু চুন-হলুদ গায়ে দিলাম।"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, দীনভাবে ব্রাহ্মণ কহিতে লাগিল,—"হুজুর দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, যাহা ইচ্ছা"—

পার্শ্বোপবিষ্ট পাপিষ্ঠ ত্রিবক্র, ব্রাহ্মণের কথায় বাধা দিয়া, মর্ম্মান্তিক ব্যঙ্গস্বরে কহিল—"মুখুযোমশাই, দুঃখিত হ'ও না। তুমি একে বৃদ্ধ হ'য়েছ, তায় সম্প্রতি স্ত্রীবিয়োগও হ'য়েছে,—তোমার বড় কষ্ট হ'চ্ছে শুনে, আমরা তোমার এক বিবাহের সম্বন্ধ স্থির ক'রেছি। পরশু তারিখে বিয়ে,—আজ গায়ে-হলুদ। তাই মহারাজ সখ ক'রে, নিজে, তোমায় হলুদ মাখিয়ে দিলেন।"

নরেন্দ্র, সাহ্লাদে, জনান্তিকে ত্রিবক্রকে কহিল,—"বলিহারি ত্রিবক্র, তোমার উপস্থিত-বুদ্ধি!"

প্রকাশ্যে কহিল,—"হাঁ হে মুখুয্যে, আসল কথা তাই বটে।"

মর্ম্মাহত ব্রাহ্মণ, পুনরায় একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, ভগ্নস্বরে, ধীরে ধীরে কহিল,—"হুজুর! আপনি প্রভু, অন্নদাতা, প্রতিপালক। আমরা আপনার আশ্রিত ও শরণাগত। আমাদের উপর হুজুরের যাহা ইচ্ছা, করিতে পারেন। কিন্তু এইটুকু স্মরণ রাখিবেন, আপনারা যাহাতে খেলার সুখ অনুভব করেন, আমাদের পক্ষে, তাহা মর্ম্মান্তিক কষ্টের কারণ হয়। আমি ব্রাহ্মণ, বয়সে বৃদ্ধ; নিতান্ত দুরদৃষ্ট না হইলে, আর এই বয়সে পোড়া পেটের-দায়ে, ঈশ্বর-চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া, এ দাসত্ব-বৃত্তি করিব কেন?"

মর্ম্মান্তিক কষ্টে, ব্রাহ্মণ এই কথা বলিয়া, দুই ফোঁটা চক্ষের জল মুছিল

ব্রাহ্মণের কাতর বাক্যে, নরেন্দ্রের মন একটু গলিয়াছে বুঝিতে পারিয়া, ত্রিবক্র, অতি কঠোরস্বরে, সেই মর্ম্মাহত বৃদ্ধকে কহিল,—"কিছু টাকার দরকার, তাই বল না;—অত 'পণ্ডিতি-কথা' কও কেন?"

নরেন্দ্র, একটু লজ্জিত ভাবে, ব্রাহ্মণকে কহিল,—"যাক্ মুখুয্যে, ও-সব কিছু মনে করিও না। ভাল কথা,—তোমার বেতন কত?"

ব্রাহ্মণ চক্ষু মুছিয়া কহিল,—"আজ্ঞে, মাসিক দশটাকা।

"বটে! আচ্ছা, আগামী মাস হইতে বিশ টাকার হিসাবে পাইবে। আর, ও কাপড়গুলা ছাড়িয়া ফেল;—আমি দেওয়ানকে হুকুম দিতেছি,—সরকার হইতে দশজোড়া নূতন কাপড় ও একশত টাকার জলখাবার পাইবে।"

নরেন্দ্র, এখন এইরূপ কুৎসিত ও লজ্জাকর আমোদ-আহ্লাদ করিয়া থাকে। বৃথায়, এইরূপে লোকের মনে কষ্ট দিয়া, পাপিষ্ঠ সুখ অনুভব করে ও সন্তপ্তজনের নীরব-অভিশাপগ্রস্ত হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সময়বিশেষে নরেন্দ্রের মনে একটু ঘাত-প্রতিঘাত হইত; একটু ভাল-মন্দ বিবেচনা করিবার ক্ষমতা আসিত। কিন্তু তাহা অতি মৃদু, অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী। যাহা হউক, ইহা হইতে, চাই কি, তাহার চক্ষু ফুটিতে পারে,—দুষ্টবুদ্ধি ত্রিবক্র ইহা বুঝিত। বুঝিত যে, নরেন্দ্রের চক্ষু ফুটিলে, তাহার সমস্ত আশা-ভরসা ও দুরভিসন্ধি লোপ পাইবে। একদিন সে ভাবিল,—"নরেন্দ্রের নিকট এত পারিষদ রাখাটা যুক্তিসঙ্গত নহে। আমি কতদিকে চক্ষু রাখিব? কি জানি, কাহার মনে কি আছে? যদি কেহ, কোন রকমে, নরেন্দ্রের মনে ভাবান্তর ঘটাইয়া দেয়?—না, ইহাদিগকেও দূর করিতে হইবে। কিন্তু ইহারা নরেন্দ্রের প্রিয়-পাত্র। হঠাৎ এতগুলা লোকের অন্ন মারিইবা কিরূপে? একটু চক্ষু-লজ্জাও হয়।"

এই ভাবিয়া পাপিষ্ঠ কি চিন্তা করিতে লাগিল। ক্ষণপরে মনে মনে কহিল,—"না,—যখন এতদূর অগ্রসর হইয়াছি, তখন আর মায়া-দয়া

কেন? যাই ত নরেন্দ্রের কাছে, আমার কথা তাহাকে রাখিতেই হইবে।"

বস্তুতঃ, পাপিষ্ঠের যে চিন্তা, সেই কাজ। সে, নানাবিধ বাক্য-কৌশলে নরেন্দ্রকে বুঝাইল যে, এই সকল পারিষদকে অগ্রে দূর করা একান্ত কর্ত্তব্য। যেহেতু, তাহারা 'পর' বৈত নয়;—স্বার্থসিদ্ধির জন্য, তাহাদের নরেন্দ্রের নিকট 'আনা-গোনা'। বিশেষ, ইহাদের দ্বারা, কখন্ কি গুপ্ত-বিষয় প্রকাশ হইয়া পড়ে! আরও, এই সকল অকালকুষ্মাণ্ডের অর্থে, নরেন্দ্রের মাসিক প্রায় চারি পাঁচ সহস্র টাকা ব্যয় হয়। খামকা এতটা টাকা বাজে ব্যয় না হইয়া, অন্য কোন সৎকার্য্যে ব্যয় হইতে পারে, বা তহবিলে মজুত থাকিতেও পারে। ইত্যাদি আরও বিবি দৃষ্টান্ত দ্বারা ত্রিবক্র প্রমাণ করিল যে, ইহাদিগকে এখনই দূর করা কর্ত্তব্য।

নরেন্দ্র, যেন তোতা-পাখী। ত্রিবক্র যে বুলি শিখাইল, তাহাই শিখিল। কহিল,—"তবে, এখনই—এই মুহূর্ত্তেই এই কয়-বেটাকে দূর করিয়া দাও।"

অতঃপর কি-একটু ভাবিয়া কহিল,—"তা শুধু পাঁচু থাকে থাক,—লোকটা ও-সব কর্ম্মে মন্দ নয়। কি বল?"

ত্রিবক্র, মস্তক কণ্ডুয়ন করিতে করিতে কহিল,—"আজ্ঞে—এ—এ—"

"'আজ্ঞে' কি হে? তোমার মত নাই? তবে সে বেটাকে অগ্রে দূর করিয়া দাও;—এখনই দাও।"

"আজ্ঞে হাঁ,—আমিও সেই কথা কহিতেছিলাম। কারণ, একজনকে রাখিয়া, আর সকলকে তাড়াইয়া দিলে, কেমন-কেমন দেখায়। আপনাকে যেমন ন্যায়পরায়ণ বলিয়া সকলে জানে, সেই খ্যাতিটুকু যাহাতে চিরদিন সমভাবে থাকে, অধীনের তাই একান্ত ইচ্ছা।"

এখানে উল্লেখ করা আবশ্যক, পাপিষ্ঠ ত্রিবক্র, পঞ্চানন-নামধারী পারিষদকেই, মনে মনে অধিক ভয় করিত। কারণ, এই লোকটা, নরেন্দ্রের কিছু প্রিয়পাত্র। বুদ্ধি-কৌশলেও সে, অন্যান্য পারিষদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহার প্রতি, ত্রিবক্রের আরও অসন্তোষের কারণ, সকলে তাহাকে যেমন মৌখিক মান্য-গণ্য করিয়া চলিত, পঞ্চানন ততটা করিত না। সে, তাহার সহিত সেই পূর্ব্ব-সম্বন্ধ বজায় রাখিয়া চলিত এবং
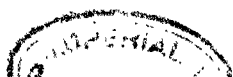
সেই ভাবেই কথা-বার্ত্তা কহিত। আর এক কথা,—একদিন এই পঞ্চাননের তোষামোদ করিয়াই, ত্রিবক্র, নরেন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছে। পঞ্চাননকে অঙ্গীকার-মত চারিআনা 'বখরা' দেওয়া দূরে থাক্,—এক্ষণে সে কৃতজ্ঞতাটুকু স্মরণ করিতেও, ত্রিবক্র নারাজ। তাই, অগ্রে, কোন রকমে, পঞ্চাননকে দূরীভূত করাই, ত্রিবক্রের একান্ত ইচ্ছা।

নরেন্দ্র, ত্রিবক্রের এ 'ন্যায়-বিচারের' অর্থ কিছুই বুঝিল না। সে, সাহ্লাদে কহিল,—"হাঁ, ঠিক বলিয়াছ। ত্রিবক্র, বলিতে কি,—শুধু এই বিচক্ষণতার জন্যই, আমি তোমায় এত ভালবাসি।"

তোষামোদপূর্ণ বাক্য প্রয়োগ-কৌশলে, ত্রিবক্র, স্বীয়, দুরভিসন্ধির কুটিল পথ, অতি সহজেই পরিষ্কার করিতে পারিল ভাবিয়া, মনে মনে একটু হাসিল। প্রকাশ্যে কহিল,—"সে হুজুরের অনুগ্রহ।"

যথাসময়ে ত্রিবক্র, একে একে সকল পারিষদকে বিদায় করিয়া দিল। কেবলমাত্র পঞ্চানন অবশিষ্ট আছে। তাহাকে বিদায় করিতে, ত্রিবক্রের একটু চক্ষু-লজ্জা হইতেছে। অথচ, তাহাকে না তাড়াইলে নয়। মূলতঃ, তাহাকে তাড়াইবার জন্যই, অন্যান্য পারিষদ তাড়িত হইল।

এই ঘটনার দুই দিন পরে, অপরাহ্ণে, ত্রিবক্র ও পঞ্চানন এক নির্জ্জন কক্ষে অবস্থিত আছে। ত্রিবক্র, ঘুরাইয়া-ফিরাইয়া, পঞ্চাননকে, মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতে প্রয়াস পাইতেছে। অর্থাৎ, নরেন্দ্র যখন সকলকেই জবাব দিয়াছেন, তখন পঞ্চানন থাকিতে পারে কিরূপে? পঞ্চাননও, ত্রিবক্রের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া, কিছু ক্ষুণ্ণভাবে কহিল,—"ভাই, আমাকে কি তবে সত্য-সত্যই যাইতে হইবে?"

ত্রিবক্রও তাহাই চায়। এতক্ষণে পঞ্চানন যে, তাহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছে, ইহাতে সে সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু প্রকাশ্যে, সে ভাব গোপন করিয়া, কিছু গম্ভীরভাবে কহিল,—"হাঁ, যখন সকলকেই যাইতে হইল, তখন তুমি থাক কিরূপে?"

পঞ্চানন কিছু ব্যথিত-হৃদয়ে কহিল,—"আমি, আর সকলে কি, তোমার কাছে সমান?"

ত্রিবক্র, আরও গম্ভীর—আরও উপেক্ষা-ভাব দেখাইল। কহিল,—

"আমার কাছে আর সমান অসমান কি? রাজার হুকুম,—পালন করিতেই হইবে।"

পঞ্চানন ঈষৎ কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া কহিল,—"রাজা কে, ত্রিবক্র? তুমিই ত রাজা,—নরেন্দ্র ত নাম মাত্র। তুমি ইচ্ছা করিলে, এখনই এ আজ্ঞা রদ্ ক'রতে পার।"

ত্রিবক্র কিছু বিরক্তিভাবে উত্তর ক'রিল,—"ওরূপ অসঙ্গত কথা বল কেন? নরেন্দ্রই রাজা,—আমি তাঁহার নফর মাত্র। তোমার অনুরোধ রক্ষা করিতে গেলে, তাঁহাকে পক্ষপাতী করিতে হয়। রাজার নিমক খাইয়া, আমি এমন কাজ করিতে পারি না!"

পঞ্চানন আবার একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসিল; এবার কিছু সাহসভরে কহিল,—"ত্রি' আমি কি তোমার কাছে অপরিচিত,—নূতন লোক?—কিছু জানি না,—কিছু বুঝি না?"

কথায় কথা বাড়িল। ইহাতে ত্রিবক্রের সুবিধাই হইল। এখন এই কলহ-উপলক্ষে, সে, সহজেই তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারিবে। ত্রিবক্রও, কিছু সুর চড়াইয়া কহিল,—"কি জান,—কি বুঝ? তোমার যে দেখিতেছি, কিছু লম্বা-চৌড়া কথা! পঞ্চানন, ওরকম কথা, পুনরায় মুখে আনিও না, বলিতেছি!"

"বলি, রাগ করিও না!"

বলিয়া, পঞ্চানন, ত্রিবক্রের অঙ্গুল স্পর্শ করিয়া কহিতে লাগিল,—"বলি, রাগ করিও না! দেখ ত্রিবক্র, নরেন্দ্রের বিদ্যা-বুদ্ধি জানিতে আমার বাকি নাই। আমি অনেক দিনের পাপী,—তাহাকে বিলক্ষণরূপ চিনি। তাহার উপর ভাই, তুমি আসিয়া, তাহাকে, একটি 'আস্ত জানোয়ার' বানাইয়াছ! নরেন্দ্র এখন তোমার মুঠার ভিতর;—কলের পুতুলটির মত, তুমি এখন তাহাকে 'উঠ্‌বস' করাইতে পার। এই যে আমাদের এতগুলি লোকের অন্ন উঠিল, ইহা কাহার পরামর্শে হইল, বুঝিতে কি বাকি থাকে? কিন্তু ভাই ত্রিবক্র, আর যাহার সহিত যাহা কর, আমার সহিত এ-রকম ব্যবহার করা, তোমার ধর্ম্মসঙ্গত নয়! পূর্ব্বের কথা মনে করিয়া দেখ!"

ধর্ম্মের নামে, পাপিষ্ঠ, বিলক্ষণরূপ চটিল। তাহার উপর, ইঙ্গিতে,

তাহার পূর্ব্বাবস্থা—যেরূপে পঞ্চানন, তাহাকে নরেন্দ্রের নিকট পরিচিত করিয়া দেয়, সেই কথা আভাষে, তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিল। মুহূর্ত্ত-মধ্যে, চতুর ত্রিবক্র সমস্ত বুঝিল। বুঝিল যে, সে, পঞ্চাননের সহিত, ঘোর অকৃতজ্ঞের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে। কিন্তু ইহাতে পাপিষ্ঠ, লজ্জিত হওয় দূরে থাক,—বরং অধিক ক্রুদ্ধ হইল। রোষকষায়িত-নেত্রে, স্বাভাবিক কর্কশ কণ্ঠস্বর আরও কর্কশ করিয়া, বিকৃত মুখে কহিল,—"দেখ পঞ্চানন, তোমায় ভালয়-ভালয় বলিতেছি, তুমি এখনই—এই মুহূর্ত্তেই, এখান হইতে দূর হও! নহিলে, আমি দ্বারবান দ্বারা, অপমান করিয়া, তোমাকে তাড়াইয়া দিব।"

ত্রিবক্র, ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। মুখে সকল কথা ফুটিয়া বাহির হইল না।

ত্রিবক্র, পঞ্চাননের নিকট উপকৃত,—পঞ্চানন তাহার উপকারক। পঞ্চাননের এ আত্মাভিমান, পূর্ব্ব হইতেই ধিকি ধিকি জ্বলিতেছিল; এইবার তাহা প্রবল মূর্ত্তি ধারণ করিল। যেহেতু সেই উপকৃত ব্যক্তিই, তাহাকে, মর্ম্মান্তিক অপমান করিতেছে! ইহা, পঞ্চাননের অসহ্য হইল। সেও অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া, কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—"ত্রিবক্র, ধর্ম্ম কি নাই? একবার নিজের বক্ষে হাত দিয়া, উপরপানে চাহিয়া বল দেখি,—ধর্ম্ম কি নাই? ইহার ফল কি তোমাকে ভোগ করিতে হইবে না? ত্রিবক্র, আমরাও মহাপাপী বটে,—জীবনে অনেক পাপ করিয়াছি, অর্থের লালসায় অনেক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, কিন্তু তোমার মত মহাপাপী বুঝি জগতে আর দ্বিতীয় নাই! আমরাও পাপী বটে কিন্তু তোমার মত নিমক্-হারাম নহি!—উপকারী বন্ধু বা প্রভুর সর্ব্বনাশ চেষ্টাও করি না!"

পঞ্চানন, ক্রমেই অধিকতর উত্তেজিত হইতে লাগিল। তাহার স্বর আরও গম্ভীর হইয়া আসিল। সে, পুনরায় দ্বিগুণ উত্তেজনায় কহিতে লাগিল,—"ধর্ম্ম কি নাই, ত্রিবক্র? পূর্ব্বের কথা মনে করিয়া দেখ দেখি!—আমিই তোমাকে নরেন্দ্রের নিকট নিযুক্ত করিয়া দিই। একদিন তুমি আমারই পদপ্রান্তে পড়িয়া, আজ এত-বড়-লোক হইয়াছ! আমার সহিত তোমার কি বন্দোবস্ত ছিল, মনে আছে কি?—মনে থাকিবে কেন,—এখন কি তুমি আর সে ত্রিবক্র সরকার আছ! জানি, তোমারই

ষড়যন্ত্রে অনেকের অন্ন উঠিয়াছে, আমারও উঠিল। সব জানি,—সব বুঝি, ত্রিবক্র! কিন্তু নিশ্চয় জানিও, ধর্ম্ম কখনই তোমার এ অত্যাচার সহিবেন না!"

ত্রিবক্র, এতক্ষণ নির্ব্বাক—নিস্পন্দাবস্থায়, সমস্ত শুনিতেছিল। শুনিয়া, ক্রোধে তাহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। কখন বা ধর্ম্মের নামে ভয় পাইয়া, মনে মনে কি ভাবিতেছিল। পঞ্চাননের মর্ম্মভেদী বাক্য-বাণে, তাহার হৃদয়ের অন্তস্তল বিদ্ধ হইতেছিল! ভাবিয়া দেখিল, পঞ্চানন যাহা বলিতেছে, সকলই সত্য। অমনি, এককালীন-শত-সহস্র-বৃশ্চিক-দংষ্ট্রের ন্যায়, আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, উন্মত্তভাবে কহিয়া উঠিল,—"কে আছিস রে, এখানে? শীঘ্র আয়!—এ বদ্‌মায়েস বেটার মুখে জুতা মারিয়া দূর করিয়া দে।"

মুহূর্ত্ত মধ্যে, দোবে, চোবে, রামসিং পাঁড়ে প্রভৃতি চারি-পাঁচজন ষণ্ডা-গুণ্ডা দ্বারবান তথায় উপস্থিত হইল। ত্রিবক্র ক্রোধে কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল,—"দে,—বেটার মুখে শাঁড়াসী পুরে দিয়ে জিব টেনে বার্ কর্। যেন আর কথা কহিতে না পারে

অতঃপর, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল,—"দে,—এখনই বেটাকে গলা ধাক্কা দে দূর ক'রে দে! সাবধান, এ বেটা যেন আর কখন বাড়ীর ভিতর আসিতে না পারে! বেটা—চোর!"

এই অপমানে, পঞ্চাননও ক্রোধে অধীর হইল; কম্পিত-কণ্ঠে কহিল,—"বটে, আমি চোর! দেখ্ ত্রিবক্র, ধর্ম্ম আছে! একদিন-না-একদিন তোকে এর প্রতিফল ভোগ করিতে হইবে! আমায় আজ তুই যে রকম মর্ম্মাহত করিলি,—দেখিস্ পাষণ্ড, ইহাপেক্ষা শতগুণ মনস্তাপ পাইবি! নহিলে ধর্ম্ম মিথ্যা!"

ত্রিবক্র, সক্রোধে, মুখ ভেঙ্গাইয়া, দ্বারবানদিগের প্রতি কহিল,—"দাঁড়িয়ে দেখছিস কি, মেড়ুয়ারা! এ বেটা চোর! লোয়ার সিন্দুক ভেঙেছিল।

"ওঃ, তোম্ আদ্‌মি চোট্টা হ্যায়!" বলিয়া দ্বারবান্‌গণ, গলাধাক্কা দিয়া, পঞ্চাননকে মারিতে মারিতে বাটী-বহিষ্কৃত করিয়া দিল।

যথাসময়ে, ত্রিবক্র, নরেন্দ্রের জন্য, আর একদল 'মো-সাহেব' নিযুক্ত

করিল। প্রভুর সহিত, তাহাদের একটু 'মাথামাথি' হইতে-না-হইতে, কৌশলে, তাহাদিগকেও দূরীভূত করিয়া দিল। আবার একদল আসিল; —ত্রিবক্র সদাই সন্দিগ্ধমনা,—কিছুদিনের মধ্যে, তাহারাও দূরীভূত হইল। সে, এক লোককে, নরেন্দ্রের নিকট, অধিক দিন রাখিত না। তাহার মনে সদাই ভয়,—"কি জানি, কাহার্ পরামর্শে, কখন্ কি হয়!" পাছে,তাহার ঘোর দুরভিসন্ধি ব্যর্থ হইয়া,সমস্ত আশা-ভরসা লোপ পায়।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

ত্রিবক্র, জগৎ-সংসারের উপর রাগ করিয়া, নরেন্দ্রের সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছে; সুতরাং তাহার পাপ-তৃষা, সহজে মিটিবার নহে। সে, সদাই ভাবিত,—"জগতে এত বৈষম্য কেন? যে দিকে, যাহার পানে চাহিয়া দেখি, সেই-ই যেন বৈষম্যের চরমমার্গে বিরাজিত। রূপে বল, গুণে বল; ধনে বল, মানে বল; পদে বল, সম্ভ্রমে বল,—আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয় কে? ভাল, আর আর বিষয়ে যেন সহ্য করিলাম; কিন্তু সমস্ত পৃথিবীতে, আমার মত কা'র পিঠে কুঁজ আছে? আমাকে দেখিলে, সকলেই হাসে কেন? আমি কি সত্যই সং-এর মত?"

কখন ভাবিত,—"ভাল, এখন ত আমার অবস্থা অনেক ভাল হইয়াছে;—নরেন্দ্রের কৃপায়, এখন ত আমি দশের-একজন হইয়াছি; কিন্তু তবুও মনে শান্তি পাই না কেন? যাকে তৃপ্তি বলে, তা ত কখন পাই না! ইহার অর্থ কি?"

একদিন, পাপিষ্ঠ মনে মনে ভাবিল,—"আচ্ছা, নরেন্দ্রকে যে আমি এত অধঃপাতে দিতেছি, ইহা কি আমার কর্ত্তব্য-কর্ম্ম হইতেছে? সে, আমাকে প্রাণের বন্ধু ভাবিয়া, তাহার যথাসর্ব্বস্ব—ধন-মান-প্রাণ সকলই আমার হস্তে দিয়াছে; আর আমি নিতান্ত বিশ্বাসঘাতকের ন্যায়, তার সর্ব্বনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছি;—এটা কি আমার পক্ষে ভাল?"

ত্রিবক্র, কিছুক্ষণ গম্ভীরভাবে, এই বিষয়ের আলোচনা করিতে লাগিল। এমন সময়, সুমতি ও কুমতি তাহার মনোমধ্যে আবির্ভূত হইল। মানুষ যতই কেন পাষণ্ড-পিশাচ হউক না,—কোন-না-কোন সময়ে,

তাহার বিবেক-বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়া থাকে। কিন্তু পাপমতি মূঢ়জন, 'মনকে চোক ঠারিয়া' সেই বিবেককে পদ-দলিত করিয়া চলিয়া যায়। হতভাগ্য ত্রিবক্রেরও উপস্থিত মনোভাব যেরূপ, সুমতি ও কুমতির কথোপকথন দ্বারা, আমরা তাহার একটু আভাষ দিব।

সুমতি কহিল,—"ভাল ত্রিবক্র! তোমায় একটি কথা জিজ্ঞাসা করি;—তুমি আর যাহার উপর চটা হও বা না হও, সে জন্য, কোন কথা কহি নাই; কিন্তু নরেন্দ্রের উপর তোমার এত বিদ্বেষ কেন? যে দিক দিয়া যে ভাবে দেখ, সে তোমার ভাল বৈ মন্দ করে নাই। কিন্তু তুমি তাহার সহিত ঘোর অকৃতজ্ঞের ন্যায়, বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছ;—এটা কি তোমার ধর্ম্মসঙ্গত কার্য্য হইতেছে?"

ধর্ম্মের নামে ত্রিবক্রের কুমতি জ্বলিয়া উঠিল। ব্যঙ্গস্বরে উত্তর করিল,—"আ মলো, তুই মাঝে মাঝে ধর্ম্মের দোহাই দিস্ কেন? ধর্ম্মটা আবার কি? ও-সব যত গাঁজাখুরি কথা। যখন যাহা মনে আসিবে, করিবে; তার আবার ধর্ম্মাধর্ম্ম কি?"

সুমতি কহিল,—"বটে! তবে অধঃপাতে যাও,—মর!"

"মরি মর্‌ব,—তাতে তোর কি? তুই কেন এসে, গায়ে-প'ড়ে ঝগড়া করিস্?"

এ কথায় সুমতি একটু নরম হইয়া কহিল,—"আচ্ছা ভাল,—দুর্ব্বুদ্ধিতে ধর্ম্ম ত মান্‌লে না,—নিজেই গোল্লায় যা'বে। কিন্তু আর একটা কথা বল্‌ব?"

"কি বল্‌বে, বল না;—অত ভণিতা কর কেন?"

"আচ্ছা, নরেন্দ্রের অপরাধটা কি? যে দিক দিয়া দেখ, সে তোমার ভাল বৈ—"

"ওগো, তা'ত বুঝ্‌লেম;—ও কথা ত একশ'বার হ'য়েছে; এখন কি বল্‌বে, বল।"

"ভাল কথা কইতে গেলেই তুমি মার্‌তে উঠ। বল্‌ছিলাম কি, নরেন্দ্র ত তোমার কাছে কোন অপরাধী নয়। তবে, বিনাদোষে একজনকে মেরে লাভ কি? বিশেষ, তোমার নিজের তা'তে কোন ইষ্ট নাই। যাতে নিজের কোন ইষ্ট নাই,—অথচ অন্যের সমূহ ক্ষতি, তা' করা কি ভাল?"

ব'লেছি ত, ভাল-মন্দ আমি কিছু বুঝি না। আমার মনে যখন যা' আসিবে, তাই করিব।"

"একি একটা কথা?"

"কেন,—কথা নয় কেন? আমার নিজের ভাল-মন্দ কে দেখিয়াছে? আমার বিচার কে করিয়াছে? যেখানে এত অত্যাচার, এত পক্ষপাত, এত মুখ-চাওয়া-চাওয়ি এক-চোকো-ভাব; সেখানে আমি আবার ভাল-মন্দ কি দেখিব?—ইষ্ট-অনিষ্ট কি বুঝিব?"

বলিতে বলিতে, কুমতি, দুঃখ-অভিমানে একটু কাঁদিয়া ফেলিল। কাঁদিতে কাঁদিতে, দ্বিগুণ উৎসাহভরে, স্থিরপ্রতিজ্ঞাব্যঞ্জকস্বরে কহিল,—"যেরূপে, যেমন করিয়া পারি, এর প্রতিশোধ আমি লইবই-লইব। তবে আমার নাম!"

কুমতি কিছু শান্ত হইলে, সুমতি এবার কিছু নরম সুরে, ভয়ে-ভয়ে কহিল,—ঘোর পাষণ্ডের নিকট, ধার্ম্মিক যেমন ভয়ে-ভয়ে ধর্ম্মকথা কহে,—সেই ভাবে কহিল—"কিন্তু বলি বোন্,—নরেন্দ্রের কোন অপরাধ নাই,—তোমার নিকট সে, সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। তার প্রতি, তোমার এ রকম অত্যাচার করাটা, কোন মতে ভাল নয়।"

এবার কুমতি, একটু চাপা-রাগে, মিষ্টভর্ৎসনা-বাক্যে কহিল,—"আবার ঐ কথা! তোমার এ 'পণ্ডিতি'-যুক্তি আমি মানি না। বড় যে বিচার করিতে বসিয়াছ, আমার আসল কথার কি উত্তর দিলে, বল দেখি?"

"উত্তর আর কি দিব বল! তুমি বোন্, অত 'নিজের কথা পাঁচ-কাহন' করিলে আর কি বলিব? এই দেখ,—এ জন্মে সুখ-ঐশ্বর্য্য ভোগ করা, রূপ-গুণ লাভ করা, দশের মধ্যে একজন হওয়া,—এ সব নিজের-নিজের অদৃষ্টের ফল। বলি বোন্,—রাগ করিও না,—পূর্ব্ব-জন্মে যে যেমন কাজ করে, এ জন্মে, ঈশ্বর তা'কে তারি যোগ্য ফল দেন! পুণ্য কর, তারি মত পুরস্কার পাবে; পাপ কর, তারি যোগ্য শাস্তি পাবে। কতক এ জন্মে পাবে,—কতকটা তোলা রহিল,—পরজন্মে ভোগ করিবে। "আর্শীতে মুখ দেখা আর কি;—হাস, হাসিবে; ভেংচাও, ভেংচাইবে!" তাই বলি বোন্,—কাহারও উপর ক্রোধ-হিংসা করিতে নাই। ভগবান যেমন অবস্থা দিয়াছেন, তাতেই সন্তুষ্ট থাকা ভাল।

যখন একান্ত অধৈর্য্য হইয়া উঠিবে, তখন আপনার চেয়ে কোন অধম লোকের অবস্থা তুলনা করিয়া দেখিলে, এ ক্ষোভ আর থাকিবে না। সংসারে অধমাধম বিরল নহে।"

ধর্ম্মের নামে, কুমতি, এবার বিলক্ষণরূপ জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু প্রকাশ্যে, সে ভাব গোপন করিয়া, ব্যঙ্গচ্ছলে কহিল,—"আ মরি! এই বুদ্ধি ধরিয়া, তুমি যখন-তখন আমাকে হিতবাক্য বুঝাইতে এস! ভাল,—তোমার বুদ্ধি তোমার থাক,—আমার সহিত তুমি আর কথা কহিতেও আসিও না।"

"তবে মর,—গোল্লায় যাও!"

এই বলিয়া, সুমতি প্রস্থানোদ্যতা হইলে, কুমতি রাগিয়া কোমর বাঁধিয়া, তাহার অঞ্চল ধরিয়া টানিল। পরে কহিল,—"হাঁ লা, তুই যে আমাকে, অকারণে কতকগুলা শাপ-গাল দিয়ে গেলি,—জিজ্ঞাসা করি,—নরেন্দ্র তোর কে? চক্ষু নাই,—দেখিতে পাওনা, তার আমায় কত প্রভেদ! সে দেশের জমিদার, অগাধ সম্পত্তির অধিপতি, আর আমি একজন নগণ্য গৃহস্থমাত্র,—কায়-ক্লেশে কোন রকমে জীবিকা নির্ব্বাহ করি! সে, সকলের গণ্য-মান্য,—দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা,—আর আমি কোন্ কীটানুকীট,—আমায় কেহ ডাকিয়াও কথা কহে না। আর ক্ষমতা এমনি যে, একটা 'মশা' মারিলেও, দশের কাছে তাহার কৈফিয়ৎ দিতে হয়। তবে বলিবে, নরেন্দ্রের কৃপায়, এখন আমার অনেকটা আধিপত্য হইয়াছে,—ধন-ঐশ্বর্য্য-মান-সম্ভ্রম বৃদ্ধি পাইয়াছে। কথা সত্য। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যাহার আপনার-'মা' নাই, বিমাতাকে 'মা' ডাকিয়া কি সে তেমন তৃপ্তি লাভ করিতে পারে? পরের ধনে পোদ্দারী করা, পরের বলে বলীয়ান্ হওয়া, আর পরের মানে মান পাওয়া, কয়দিনের জন্য? আমার সম্মুখে নয় আমাকে সকলে মান্য করে, ভয় করে; কিন্তু অসাক্ষাতে, তাহারা কি আমায়, নরেন্দ্রের 'মো-সাহেব'—ভাঁড়ের অধিক ভাবিয়া থাকে? দেখিতে পাও না, সকল বিষয়েই সে শ্রেষ্ঠ, আমি হীন; সে উত্তম, আমি অধম। দেখিতে পাও না, সে রূপবান্, আমি কুৎসিত; সে ধনী, আমি নির্দ্ধন; সে প্রভু, আমি ভৃত্য! দেখিতে পাও না, সে বাবু, আমি মো-সাহেব; সে দাতা, আমি গৃহীতা; সে রঙ্গ-দর্শক, আমি

ভাঁড়! হায়, কোন্ পাপে—কাহার অভিশাপে, আমি এ গুরু-দণ্ড ভোগ করিতেছি? কি জন্য আমার এমন দশা? ঈশ্বর যদি অপক্ষপাতী,—ন্যায়পরায়ণ, তবে জগতে এত বৈষম্য কেন?—কেহ পাল্কী চড়ে, কেহ বহিয়া মরে; কাহারও দুধে চিনি, কাহারও শাকে বালি! কেন এরূপ হয়? পৃথিবীতে কি বিচার আছে? ইহার সর্ব্বত্রই অবিচার, সর্ব্বত্রই পক্ষপাত-দোষে দুষ্ট! এ ঘোর অবিচারের রাজ্যে, আমি আবার ন্যায়-অন্যায় দেখিব কি? আমার বিচার কে করিয়াছে? কে ঈশ্বর? কোথায় ধর্ম্ম? তবে নরেন্দ্রকে হাতে পাইয়া, আমি ছাড়ি কেন? ইহাকে বিধি-মতে উচ্ছিন্ন দিব, অধঃপথের চরম সীমায় লইয়া যাইব, তবে আমার দারুণ প্রতিহিংসা-বৃত্তি মিটিবে, তবে আমার প্রাণের জ্বালা জুড়াইবে! এ কথা তোমায় স্বরূপ কহিলাম। ইহাই আমার জীবনের ব্রত!"

এই বলিয়া কুমতি, দারুণ দুঃখ অভিমান-ক্রোধে কাঁপিতে লাগিল। সুমতি, পাপীর পরিণাম দেখিয়া, ভীত, চকিত, স্তম্ভিত হইল। পরিশেষে কহিল,—"তোমার যাহা ইচ্ছা হয়, কর; আমি একেবারেই অন্তর্হিত হইতেছি!"

কিন্তু, এটা কথার কথা। আমরা জানি, এখন প্রায় প্রতিদিনই, ত্রিবক্রের সুমতি-কুমতিতে, এইরূপ দ্বন্দ্ব হইয়া থাকে। প্রতিদিনই কুমতির জয় হইত, সুমতি হারি মানিয়া চলিয়া যাইত। হায়, সংসারের কত শত-সহস্র ত্রিবক্র যে এরূপ চিন্তায়, নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করিতেছে, কে বলিবে!

নবম পরিচ্ছেদ।

"মা, বাবার-আমার তবে এমন দুর্ম্মতি কেন হ'ল? তাঁর গতি তবে কি হ'বে মা?"

চতুর্দ্দশবর্ষীয়া, পরম লাবণ্যবতী একটি বালিকা, এই কথা বলিয়া, কাতর-নয়নে, তাহার জননীর মুখপানে চাহিয়া রহিল।

জননীও, অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কহিলেন,—"মা, সকলই বিধাতার ইচ্ছা। দেবতা আমাদিগের প্রতি বাম,—তাঁর দোষ কি মা"

"মা, সত্য বলিতে কি,—বাবার জন্ত আমার বড় ভয় হয়। সদাই মনে হয়, বুঝি, তিনি কোন বিপদে পড়িলেন!"

এক প্রকোষ্ঠে বসিয়া, মা ও মেয়েয়, এইরূপ কথোপকথন হইতেছিল। হঠাৎ এরূপ আশঙ্কা ও উদ্বেগের কারণ, জননী, কবি-গুরু বাল্মীকির, সুধার-সমুদ্র রামায়ণ পাঠ করিতেছিলেন,—কন্তা, একাগ্রচিত্তে, তন্ময়-ভাবে তাহা শুনিতেছিল। যেখানে প্রবল পরাক্রান্ত, প্রচণ্ডতেজা, দুর্জ্জয় দশানন, প্রেম-প্রতিমা সীতা-সতীর অভিশাপ-দীর্ঘশ্বাসে, ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছিল;—অমিততেজাঃ শৌর্য্য-বীর্য্য-সম্পন্ন, নয়নমণি, শত শত বংশধর, যেখানে একে একে কালের কোলে অঙ্গ ঢালিয়া দিতেছিল;—পাপ-পুণ্যের তুমুল-সংগ্রামে, যেখানে ধর্ম্মের জয় ও অধর্ম্মের ক্ষয় প্রত্যক্ষীভূত হইয়া জীব-জগৎকে শিক্ষা দিতেছিল,—সেই গভীর উদ্দামভাবপূর্ণ অংশটুকু পাঠ করিয়া জননী চক্ষের জল মুছিলেন;—কন্তার কোমল প্রাণেও সেই জীবন্ত-চিত্রের ছায়া পড়িল; কি-এক ভাবী অমঙ্গলের ভীষণ-দৃশ্য মনশ্চক্ষে দেখিতে পাইয়া, কাতর প্রাণে, করুণ-কণ্ঠে, জননীকে কহিল,—"মা! বাবার-আমার তবে এমন দুর্ম্মতি কেন হ'ল? তাঁহার গতি তবে কি হবে মা?"

পাঠক, এই ভাবময়ী স্ত্রীলোকটি ও বালিকাটি কে, জানিতে পারিয়াছ কি? মহাকাব্যের মহাকথার আলোচনা করিয়া, কেন ইহাদের মনে ভাব-বিপর্য্যয় ঘটিল,—হৃদয়-স্রোতে আকস্মিক ঘাত-প্রতিঘাত হইল, বুঝিয়াছ কি? প্রকৃতির কি ঘোর বৈষম্য, দেখ!—এই পতিব্রতা—পতি-ব্রতা রমণীটি, পাপিষ্ঠ ত্রিবক্রের ধর্ম্মপত্নী, আর ফুটনোন্মুখ এই কমল-কলিকাটি, তাহার করুণাময়ী কন্তা! হায় ত্রিবক্র! এমন মাধুর্য্যময়ী দেব-বালাদ্বয়ের উপাস্ত-দেবতা হইয়া, কেন তুমি এমন অধম, পাপাচারী, দুর্ম্মতিপরায়ণ, নরকের কীট হইলে?—এমন অসৎ-পথে, কেন তোমার মতি-গতি ধাবিত হইল?

বস্তুতঃ, ত্রিবক্রের স্ত্রী-ভাগ্য ও কন্তা-ভাগ্য, বড়ই সুন্দর—বড়ই উত্তম। সংসারে, সচরাচর, সকলের ভাগ্যে, সহসা, এরূপ বড়-একটা মিলে না। পূর্ব্বজন্মের অনেক পুণ্যফলে, এমন স্ত্রী-কন্তা লাভ করা যায়। ত্রিবক্রের এই বরণীয়া বনিতার নাম—কমলা; আর দয়াবতী এই দুহিতাটির নাম—

দুলালী। কমলা ত, সত্য কমলাই বটে। রূপে-গুণে কমলা, সত্যই কমলার স্থান অধিকার করিয়াছেন। চাঁপাফুলের ন্যায় সোণার বর্ণ, সুকান্তি মুখ-চন্দ্রমা,—সুরূপা, সুলক্ষণা, সুহাসিনী, সুভাষিণী কমলাকে দেখিলে, সত্যই সাক্ষাৎ-কমলা বলিয়াই ভ্রম হয়। এমন শান্ত-শিষ্ট, ধর্ম্মরতা পতিব্রতা রমণী, বাসন্তীপুরে আর দৃষ্টিগোচর হয় না। সুকুমার কারুকার্য্যে এবং শিল্প-সাহিত্যেও কমলার কিছু কিছু অধিকার আছে। এমন রূপে লক্ষ্মী, গুণে সরস্বতী-সদৃশী কমলার স্বামি-ভাগ্য কেন যে, এমন হইল, কে বলিবে ?

ভাগ্যক্রমে, কন্যাটিও জননীর রূপ-গুণ লাভ করিয়াছে। দুলালী ত, দুলালা-লতাটির মত, সৌন্দর্য্য-প্রেমে মিশামিশি হইয়া, অহর্নিশি নৃত্য করিতেছে! প্রস্ফুটিত চম্পককুসুমের ন্যায় বর্ণ; শারদীয় মুখচন্দ্রবিনিন্দিত সরল মুখারবিন্দ; বিশাল পদ্ম-চক্ষু—তাহা সলজ্জ, স্থির, কটাক্ষহীন, সকরুণ,—প্রকৃতি-দর্পণের সে শোভা অতুলনীয়; খগরাজ-লাঞ্ছিত সুন্দর নাসা; গৃধিনী-গঞ্জিত সুরঞ্জিত শ্রুতিযুগল; ভ্রমর-কৃষ্ণবর্ণযুগ্ম-ভ্রূ; শুভ্রবর্ণ, উজ্জ্বল, মুক্তাবলীর ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দন্তশ্রেণী; নিবিড় কাদম্বিনী সদৃশ, সুবিস্তৃত, সুকুঞ্চিত, সুচিক্কণ কেশদাম;—এলায়িতবেশে তাহা কপোল, বাহুপৃষ্ঠ ও নিতম্বদেশ স্পর্শ করিয়া, অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিয়া থাকে। অলক্তক-রাগ-রঞ্জিত, সুগঠিত সুলক্ষণ চরণ দু'খানি,—তাহার গতি অতি ধীর,—বালিকার ন্যায় দ্রুত ও চঞ্চল নহে;—তদুপরি দেহ-রত্ন,—যেন শতদলে মূর্ত্তিমতী কমলা! শরীরের গঠন নাতিস্থূল-নাতি-শীর্ণ —সৌন্দর্য্যেরই উপযোগী। এ সৌন্দর্য্য-প্রতিমার শোভা অতুলনীয়া। সে অনির্ব্বচনীয় সরল মুখখানিতে বালিকার সমগ্র প্রকৃতিখানি খুলিয়া রাখিয়াছে।

ইহা ত গেল বাহ্য-সৌন্দর্য্যের কথা। বালিকার আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য আরও মনোহর—আরও সুন্দর। ধর্ম্মে বিশ্বাস, গুরুজনে ভক্তি; দেব-দ্বিজে শ্রদ্ধা, বালক-বালিকায় স্নেহ, দীন-আতুরে দয়া, ব্যথিতে সহানুভূতি,—বালিকার মর্ম্মে মর্ম্মে নিহিত। পরের মর্ম্মকথা বুঝিতে, ব্যথিতের ব্যথা অনুভব করিতে, পরের প্রাণে প্রাণ মিশাইতে, বালিকা বিশেষ অভ্যস্তা। মায়ের যোগ্য মেয়ে বটে! স্ফুটনোন্মুখ যৌবনের

এই চতুর্দ্দশ বর্ষে, সোহাগিনী দুলালী, সরোবরের শ্বেতদলের ন্যায়, সদাই চল-চল করিতেছে। পক্ব-বিম্বাধরে মৃদু-মধুর হাসি, ফুল্লনয়ন-কোণে প্রেম-করুণা মিশামিশি করিয়া, সৌন্দর্য্য-প্রতিমা দুলালীর লাবণ্য-লীলাকে বড়ই মধুর করিয়া তুলিয়াছে।

কমলা, শিক্ষিতা-জননী। কন্যা দুলালীও মায়ের নিকট কিছু কিছু শিখিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি মহাপুরাণের মহা-মহা-কথা পড়িয়া, শুনিয়া, বুঝিয়া, তাহার স্বাভাবিক কোমল অন্তর আরও কোমল—করুণাময় হইয়া উঠিয়াছে। ভাবের কথা, ভক্তির কথা; উচ্ছ্বাসের কথা, আবেগের কথা; ধর্ম্মের কথা, দয়ার কথা,—পড়িলে বা শুনিলেই তাহার প্রাণ গলিয়া যাইত। তাই ভাবময়ী কন্যা, মায়ের মুখে রাম-চরিত শুনিয়া,—দুর্দ্দান্ত দশাননের পরিণাম দেখিয়া, আকুল-প্রাণে—কাতর-নয়নে জননীকে কহিল,—"মা, বাবার-আমার তবে এমন দুর্ম্মতি কেন হ'ল? তাঁর গতি তবে কি হবে, মা?"

ত্রিবক্রের পাপ-প্রতাপ কাহারও অবিদিত নাই। বিশেষ ইদানীং, নরেন্দ্রের বিলাস-মণ্ডপে মিশিয়া, সে, যে সকল ভীষণ লোমহর্ষণ ব্যাপার সংঘটিত করিত, তাহার আভাষ মাত্র শুনিয়া, পুণ্যবতী স্ত্রী-কন্যার কোমল-অন্তর বড়ই বাজিতে থাকিত। কিন্তু ভয় ও ভক্তি-বশতঃ, ত্রিবক্রের কাছে, তাহারা মুখ ফুটিয়া, সকল কথা কহিতে পারিত না। তাই মাতা-কন্যার সেই সদা প্রফুল্লময় মুখ-কমলে, সময়ে সময়ে, ঘোর বিষাদ আতঙ্কের ছায়া পড়িত। আর মহাগুরুর মঙ্গলোদ্দেশে, ইষ্ট-দেবতার চরণে প্রণাম করিয়া, তাহারা বিষাদে—বিরলে, দুই চারি ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিত।

কমলা পুস্তক পাঠ বন্ধ করিলেন। মনের আগুন মনে চাপিয়া, মুখে কন্যাকে সান্ত্বনা করিলেন। কহিলেন,—"মা দুলাল! ভয় কি আমাদের? নারায়ণ অবশ্যই তাঁর সুমতি দিবেন!"

এই কথা কহিয়া, তিনি পুস্তকখানি তুলিয়া রাখিতে, কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। পুস্তকখানি তুলিয়া রাখিতে, না কাঁদিতে? স্বামীর মঙ্গলোদ্দেশে, প্রকাশ্যে, ইষ্ট-দেবতার চরণে ক্রন্দন করিলে, পাছে করুণা-ময়ী কন্যার কোমল-প্রাণে দারুণ আঘাত লাগে;—ঘোর অমঙ্গল আশ-

ক্কায়, পাছে সেই ফুল্ল-লতিকাটি সহসা ম্লান হইয়া যায়;—এই কারণেও বটে,—আর প্রাণের দেবতার সহিত নির্জ্জনে কথোপকথনই শ্রেয়ঃ,—এই জন্যই হউক,—তিনি, তথা হইতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। যাইবার সময়, উর্দ্ধপানে চাহিয়া, সজল-নয়নে, মনে মনে কহিলেন,—"হে নারায়ণ, হে মধুসূদন! আমার স্বামীকে সুমতি দাও,—তাঁহার ভাল কর! হে ঠাকুর! আমি আর কিছু চাহি না,—আর কিছু বলি না,—তাঁর যেন কখন কোন বিপদ না হয়!"

জননী প্রস্থান করিলে, সুকুমারী কন্যাও, একবার চারিদিক চাহিয়া দেখিয়া, নিমিলিত নেত্রে, যুক্তকরে—মুক্ত-অন্তরে, কম্পিত-কণ্ঠে কহিল,—"হে অনাথ-নাথ, বিপদ-ভঞ্জন! আমাদের এ আসন্ন বিপদ দূর কর;—পিতার-আমার সুমতি দাও! হে জগন্নাথ,—হে দয়াল ঠাকুর! আমার পিতার প্রতি একবার কৃপা-কটাক্ষ কর!"

দেবতার চরণে কি, এ প্রার্থনা পঁহুছিল?

হা ত্রিবক্র! এমন পুণ্যবতী, পবিত্রমনা স্ত্রী-কন্যার ভাগ্যবন্ত ভর্ত্তা-জন্মদাতা হইয়া, কেন তোমার এমন ছন্নমতি—ছন্নগতি হইল? সম্মুখে সুধার সমুদ্র ফেলিয়া, কেন তুমি পূতি-গন্ধময় নরককুণ্ডে ঝাঁপ দিলে?

দশম পরিচ্ছেদ।

"কমল, কমল,—ওমা দুলু! খিড়কীর দরোজাটা একবার খুলে দিয়ে যাও দেখি, মা!"

এই কথা বলিয়া, বাহির হইতে একটি স্ত্রীলোক, দ্বারদেশে দুই চারি বার আঘাত করিল।

কমলা কিছু ভগ্নস্বরে, কক্ষান্তর হইতে কন্যাকে কহিলেন,—"দুলাল! দেখ ত মা, দিদী বুঝি এসেছেন। দরোজাটা খুলে দিয়ে আয় দেখি, মা!"

"যাই মা!" বলিয়া দুলাল উঠিল। এমন ভাবে "যাই মা" কথাটি বলিল, যাহাতে বাহিরে যে, দ্বার উন্মোচনের অপেক্ষা করিতেছে,—তাহার, ও জননীর—উভয়েরই কথার উত্তর দেওয়া হইল।

দ্বার উন্মোচন হইলে, বর্ষীয়সী এক বিধবা, ম্লানমুখে বাটী-প্রবেশ করিলেন। কমলা, অগ্রসর হইয়া কহিলেন,—"কি দিদি, তোমার মুখ-খানি অমন শুকান-শুকান কেন?"

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, বিধবা কহিলেন,—"পরে বলিতেছি। অগ্রে জিজ্ঞাসা করি,—বোন্! তোমার চক্ষে জল কেন? আর কথাও যেন কিছু ভার-ভার বোধ হইতেছে। কাঁদিয়াছ বুঝি? কেন কাঁদিলে দিদি!"

বিধবা, কমলার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন। কমলাও ভগ্নস্বরে কহিলেন,—"দিদি, তোমাকে মার পেটের-বোনের মত ভাবি,—তোমার কাছে আর গোপন করিব কি! দেখ,——"

বলিয়া, কোমল-প্রাণা কমলা অঞ্চল দ্বারা চক্ষু দুইটি একবার পরিষ্কার করিয়া লইলেন। চক্ষু পরিষ্কার করিলেন, না, মুখে অঞ্চল দিয়া, আবেগ-ভরে একটু কাঁদিয়া লইলেন? প্রিয়জনের কাছে গভীর দুঃখের কথা পাড়িতে গেলে, এইরূপ কান্নাই আসে বটে! কমলা কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থা হইয়া, বাষ্পাকুল লোচনে, গদ্গদ-স্বরে কহিলেন,—"দেখ দিদি, আমার আর কিছুতে সুখ নাই। সদাই প্রাণের ভিতর হু-হু করিতে থাকে। তাঁর জন্য আমি যে কিরূপ অস্থির হইয়াছি, তাহা অন্তর্যামীই জানেন! পোড়া-মনে সদাই তাঁর অমঙ্গল-ভাবনা উপস্থিত হয়। মনে হয়, বুঝি, তিনি কোন বিপদে পড়িলেন! তাই দিদি, আজ রামায়ণ পড়িতে বসিয়া, হঠাৎ তাঁর কথা মনে পড়িয়া, পোড়া-চক্ষে জল আসিয়াছে।"

ব্যথার ব্যথী সুকুমারী কন্যাও, অমনি মায়ের মুখের কথাটি কাড়িয়া লইয়া, কোমল কণ্ঠে, কাঁদ-কাঁদ-মুখে কহিল,—"হাঁ পিসী মা! দেখ, আমারও সেই অবধি মনটা কেমন হইয়া গিয়াছে! আচ্ছা পিসী মা, বাবা কি সত্য-সত্যই তবে কোন বিপদে পড়িবেন? আহা, বাবার-আমার তা' হ'লে কি হ'বে! মনে করিলেও শরীর শিহরিয়া উঠে!—রাক্ষস রাবণ, এক সীতার অভিশাপে সবংশে ধ্বংস হইয়াছিল,—পাপ-মুখে গুরুনিন্দা করিতে নাই—আর বাবা-আমার যে, প্রতিদিন শত সীতার শত-অভিশাপগ্রস্ত হইতেছেন! তাঁর কি পাপের সীমা আছে? পিসী মা, বাবার-আমার তবে কি হ'বে?"

সরল-প্রাণা বালিকা, সরল-প্রাণে, সরল উচ্ছ্বাসে, এই কয়েকটি কথা বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল।

সহৃদয়া রমণী করুণ-কণ্ঠে কহিলেন,—"দুলু! কাঁদ কেন মা! ভগবান যাহা করিবেন, তাহার উপর ত আমাদের আর হাত নাই। নহিলে, তাঁরই বা এমন মতি-গতি হইবে কেন?"

কমলা, কথায় বাধা দিয়া কহিলেন,—"দিদি, বুঝি সব; কিন্তু পোড়া প্রাণ ত তা'তে প্রবোধ মানে না! আর, আজ-কাল ত তিনি বাড়ী-আসা একরকম ছেড়ে দেছেন বলিলেও হয়। তাঁহার পায়ে-হাতে ধরিয়া, কাঁদিয়া-কাটিয়াও যে, ইহার কোন প্রতিকার করিব, তারও উপায় নাই।"

রমণীও সদুঃখে, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"বোন্, আমিও সেই কথা বলিতেছিলাম। তোমার কাছে সকল কথা বলিতেও কষ্ট হয়। কিন্তু বোন্, ভায়ের-আমার, অত্যাচারের কথা শুনিয়া শুনিয়া, আমারও ভয় হইয়াছে। পথে ঘাটে, ঘরে বাহিরে—সকল জায়গাতেই তাঁর কথা নিয়ে লোকে কাণাকাণি করে। বিশেষ, ঐ হতভাগা রাজা-জমিদারের সঙ্গ লওয়া অবধি, তাঁর স্বভাব আরও মন্দ হ'য়েছে। দিন-দিন তাঁর অত্যাচার বাড়ছে। বোন, বেশী বল্‌ব কি, এমন সোণার বাসন্তীপুর বুঝি, শ্মশানভূমি হ'য়ে উঠ্‌ল! একে জমিদারের বিষম নিগ্রহ, তার উপর ওঁর কুমন্ত্রণায়, ক্রমে একে একে সকলে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে! তাঁর কুযশ আর শুনিতে পারি না, বোন্!"

"দিদি, আমিও কি কম অসুখে আছি? লজ্জায়, লোকের কাছে মুখ দেখাতে পারি না। লোকে দেখিলে হাসে, বিদ্রূপ করে, টিট্‌কারী দেয়; কেহ কেহ বা তাঁর উদ্দেশে, কত অভিসম্পাত, গাল-মন্দ পাড়ে। ভাল হউন—মন্দ হউন, তিনি আমার পরম-গুরু,—হৃদয়ের আরাধ্যদেবতা;—দিদি, বলিব কি,—সে সব কথা শুনে, আমার বুকে যেন শেল বাজে!"

রমণীও একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"বোন্, আজ আবার যে কথা শুনিলাম, না জানি, কি অনর্থ ঘটে!"

সরলা দুলালী এতক্ষণ স্তব্ধ হইয়া, বাষ্পাকুল লোচনে, উভয়ের কথা শুনিতেছিল। রমণীর মুখে এই কথা শুনিবামাত্র, হাঁপাইতে

হাঁপাইতে কহিল,—"পিসী মা, কি কথা? বাবার ত কোন বিপদ হয় নাই?—তাঁর ত কোন অমঙ্গল খবর নয়?"

পিসী, উত্তর করিতে কিছু ইতস্তত করিলেন। ইহা দেখিয়া কমলা একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"দিদি, ভাবিতেছ, আমি শুনিলে উতলা হইব? কিন্তু দিদি, আমার আর নূতন উৎকণ্ঠা কি হ'তে পারে? তুমি কি বলিবে, স্বচ্ছন্দে বল। তোমার মুখ শুকান দেখিয়া, আমি তাহা অগ্রেই বুঝিয়াছি।"

রমণী, আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন,—"কমল, ওঁর শত্রু ত চারিদিকেই। এ বাসন্তীপুরে এমন জন-প্রাণীও দেখিতে পাই না, যে ওঁর অমঙ্গল না ডাকে। তবে জমিদার-বাবুর ভয়ে, সম্মুখে তাঁকে কেহ কিছু বলিতে সাহস করে না,—বরং কেহ কেহ মনস্তুষ্টিও ক'রে থাকে;—কিন্তু মনে মনে তাঁর উপর সকলেই চটা। কি রকমে তাঁর অনিষ্ট করিবে, তাঁকে বিপদে ফেলিবে, তলে-তলে সকলেই তার চেষ্টা করে। বোন, ঘোষের বাড়ীতে কাণাকাণিতে শুন্‌লেম, পঞ্চানন নামে রাজার কে একজন পারিষদ ছিল,—আজ ক'দিন হ'ল, উনি নাকি তাকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিয়েছেন। সে লোকটা নাকি, তাতে অত্যন্ত রেগে, তাঁর মুখের উপর তাঁকে শাসিয়ে গিয়েছে। আর তলে-তলে, তাঁর অনিষ্ট করিবার চেষ্টায় আছে। সে মিন্‌সেটা নাকি, একজন মস্ত ধড়াবাজ্‌! তাই ভয় হয় বোন, তাঁর কি অনিষ্ট হয়!"

দুলালা, মুখখানি কাঁদ-কাঁদ করিয়া, ব্যাকুলভাবে, জননীকে কহিল,—"মা, তবে কি হ'বে?"

তারপর, সেই সুরে, আরও ব্যাকুলভরে পিসীকে কহিল,—"পিসী মা, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এখনি, যেমন ক'রে হোক, কোন লোক পাঠিয়ে, তাকে ঠাণ্ডা কর,—সে যেন বাবার-আমার কোন অনিষ্ট না করে! আমার যাবার নয়,—নহিলে আমি এখনই যেতেম।"

পিসী, একটু কাষ্ঠ-হাসি হাসিয়া তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া কহিলেন,—"দুলাল, কি বলিস্‌ মা? তুই যাবি কোথা? আর আমিই বা কোথায় তার সন্ধান পাব, আর কা'কেই বা পাঠাব? আমার সঙ্গে কি তার জানা-শুনা আছে?"

আঁ্যা, তবে কি হ'বে!"

বালিকা আরও ভীতা ও উৎকণ্ঠিতা হইল। সুধীরা কমলা, মনের আগুন মনে চাপিয়া, প্রাণাধিকা কন্যাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। কহিলেন,—"তার আর আমরা ভাবিয়া কি করিব, মা! নারায়ণের মনে যা' আছে, হবে। দুলাল্! তুই আর কাঁদিস্‌নে মা! কাঁদিলে তাঁর অমঙ্গল হয়। এখন তোর পিসী-মার সঙ্গে ব'সে দুটো পুরাণের গল্প কর্। দিদি, বস তুমি; আমি ঘরের কাজ-কর্ম্ম করি।"

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, কমলা তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। পিসী, নানারূপ স্নেহমাখা-কথায় দুলালীকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

এখানে পিসীর কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। পিসীর নাম করুণা। কিন্তু আমরাও স্থল-বিশেষে তাঁহাকে পিসী বলিয়া উল্লেখ করিব; পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেও করিয়াছি। অতি অল্প বয়সে বিধবা হইয়া, পিসী, এই বাসন্তীপুরে ভ্রাতার আলয়ে আশ্রয় লইয়াছেন। প্রতিবাসিসম্পর্কেই দুলালী তাঁহাকে পিসী-মা বলিয়া ডাকিত, এবং কমলাও তাঁহাকে দিদি বলিতেন। ত্রিবক্রের বাটীর পার্শ্বেই তাঁহার ভ্রাতার ক্ষুদ্র কুটীর। কমলার সহিত করুণার খুব প্রণয়। তিনি কমলাকে কনিষ্ঠা ভগিনীর ন্যায় জ্ঞান করিতেন। কমলাও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠা সহোদরার ন্যায় ভাবিতেন।

এক দুলালী ভিন্ন, কমলার আর দ্বিতীয় পুত্র-কন্যা নাই। সংসারে তিনি, স্বামী, আর কন্যা—এই তিনটী মাত্র পরিবার। তবে ইদানীং—নরেন্দ্রের নিকট নিযুক্ত হওয়া অবধি, ত্রিবক্র, দুই একজন দাস-দাসী নিযুক্ত করিয়াছে। করুণা, সর্ব্বদাই ইহাঁদিগকে দেখেন-শুনেন।

দুলালী অবিবাহিত, কিন্তু বয়স চতুর্দ্দশ। ইহা ভাল কথা না হউক,—আশ্চর্য্যের কথা নহে। বর্ত্তমান হিন্দু-সমাজ, এখন অনন্যোপায় হইয়া, এ প্রথার অনুমোদন করিতেছেন। কন্যাদায়, আজি-কালিকার দিনে, হিন্দু-সমাজের পক্ষে, কণ্টকস্বরূপ হইয়াছে। এ কণ্টকের মধ্যে পড়িয়া, অনেকেরই প্রাণ যে, কণ্ঠাগত হইয়াছে, তাহা বলাই বাহুল্য।

ত্রিবক্র কিন্তু সে জন্ত কন্তাকে অনূঢ়া রাখে নাই। অন্ত বাধা থাকিলেও, দুলালীর ন্যায় রূপে-গুণে অমন স্ত্রী-রত্ন লাভ করিতে যে, কেহ পশ্চাৎপদ হইতেছে, তাহা নহে। ত্রিবক্র, ইচ্ছা করিয়াই কন্তাকে আজিও পরিণীতা করে নাই। অথবা, ধর্ম্মের গতি কে বুঝিবে?—কিছুতেই দুলালীর বর মিলিতেছে না। কত সম্বন্ধ আসিল, কত ভাল-ভাল পাত্র জুটিল,—কিন্তু ত্রিবক্রের মন কিছুতেই তুষ্ট নহে,—কোন সম্বন্ধই তাহার মনোনীত হইতেছে না। একটা-না-একটা খুঁৎ, সে, সকল পাত্রেই দেখিতে পায়। বুঝি, নিজ প্রকৃতির প্রতিকৃতি সর্ব্বত্রই দেখিয়া থাকে।

চতুর্দ্দশবর্ষীয়া কন্তা যাহার গলগ্রহ, সে কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে? কিন্তু ত্রিবক্রের সকলই বিপরীত। হিন্দুবংশে সে, জন্মগ্রহণ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার অন্তরে, হিন্দুত্বের লেশমাত্রও নাই। কমলা, কন্তার বিবাহের কথা উত্থাপন করিলেই, ত্রিবক্র, তাহার স্বাভাবিক কঠোর উক্তিতে, সহধর্ম্মিণী প্রতি তর্জ্জন-গর্জ্জন করিত, নানারূপ কু-ব্যবহার করিত,—কোন কোন দিন পতিব্রতার অদৃষ্টে, প্রহার অবধি ঘটিয়া যাইত।

ত্রিবক্র, সংসারে কাহার উপরও তুষ্ট নহে। এমন যে, পতিরতা—পতিব্রতা, সাক্ষাৎ কমলাসদৃশী, করুণাময়ী কমলা,—এ-হেন অনুপমা স্ত্রী-রত্নকেও, ত্রিবক্র, বিষ-নয়নে দৃষ্টি করে। উঠিতে-বসিতে—সকল সময়েই তাঁহাকে নির্যাতন করে। সুশীলা পত্নী, অমানুষী সহিষ্ণুতাগুণে, নিষ্ঠুর স্বামীর সে সকল কঠোর ব্যবহার, অম্লান-বদনে সহ্য করেন। প্রত্যুত্তর করা দূরে থাক,—মুখের কথাটি বাহির না করিয়া, বিষাদে—বিরলে, ইষ্ট-দেবতার চরণে, প্রাণের গভীর-মর্ম্ম-ব্যথা জানাইয়া, স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকেন।

কিন্তু "মানুষ যতই কেন পাপিষ্ঠ-পিশাচ হউক না, যতই কেন কঠোর-নিষ্ঠুর হউক না,—তাহার হৃদয়ের এক-কোণে, একটু মনুষ্যত্ব পড়িয়া থাকিবেই। ভালবাসাকে মনুষ্যত্ব বলে। যে, জগতের উপর যত চটা, তাহার ভালবাসাটুকু ততই খাঁটি। জগতের উপর ত্রিবক্র, যেমন চটা, আপন কন্তা দুলালীকে তেমনই ভাল বাসিয়া, ত্রিবক্র

আপনার হৃদয়ের তুল-দাঁড়ি সমান রাখিয়াছিল।" প্রাণাধিকা তনয়া—দুলালীই তাহার সংসারের একমাত্র বন্ধন। তাহাকে প্রাণান্তপণে ভাল বাসিয়া, হৃদয়ের সর্ব্বস্ব দিয়াও, ত্রিবক্রের আশা তৃপ্ত হয় নাই। সেই জীবন-সর্ব্বস্ব কন্যাকে চিরদিনের মত পরের হাতে তুলিয়া দিতে হইবে; তাহার জীবনের ভাবী সুখ-দুঃখ, আকাঙ্ক্ষা-আশা, প্রেম-পবিত্রতা—সকলই পরের অদৃষ্টে নির্ভর করিবে,—সুতরাং এমন ভাল-বাসার জিনিসকে, জন্মের মত পরকে বিলাইয়া দিতে, ত্রিবক্রের ন্যায় সদা-অসন্তুষ্ট, সন্দিগ্ধমনা ব্যক্তির সহসা সাহস হইতেছে না। তাই আজ-নয়-কাল, এ মাস-নয় ও-মাস করিয়া, কন্যাকে আজিও—এই যৌবনকাল-সমাগত চতুর্দ্দশ-বর্ষ অবধি, অনূঢ়া রাখিয়াছে। কোন পাত্রই তাহার মনোনীত হইতেছে না।

দশ পরিচ্ছেদ।

একদিন কমলা, করুণার নিকট নিজ দুঃখ-কাহিনী প্রকাশ করিতে করিতে কহিলেন,—"দিদি, আমি ত আর বাঁচি না। ভাবিয়া ভাবিয়া, প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে। তাঁর ভাবনা আর নূতন করিয়া কি বলিব,—সে ত আমার সঙ্গের সাথী,—চিতায় না উঠিলে, তাহা আর ভুলিতে পারিব না। কিন্তু দিদি, দুলালের ভাবনায়, আমি আরও অস্থির হইয়াছি। শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, দুলাল্ আমার পনরয় পা দিতে যায়;—আর কত কাল তাকে আইবুড় রাখিব দিদি!"

করুণা উত্তর করিলেন,—"বোন্, যাহা বলিতেছ, সকলই সত্য। কিন্তু তুমি, ভাবিয়া কি করিবে বল? তুমি মেয়ে মানুষ,—তোমার ত কোন হাত নাই বোন্! যার মেয়ে, সেই যখন নিশ্চিন্ত,—কাহারও সহিত পরামর্শ করিবে না,—কারও কথা কাণে লইবে না,—তখন তোমার আর এ মিছা ভাবনায় কি হইবে বোন্! ভবিতব্য যা আছে, হ'বে। আর, যদি সত্য সত্যই বিধাতা, দুলালের ভাগ্যে বর না লিখে থাকেন, তুমি মাথা-মুড় খুঁড়িলেও তাহা মিলিবে না।"

"দিদি, বুঝি সব। কিন্তু পোড়া প্রাণ ত তাতে প্রবোধ মানুতে

চায় না। সত্য দিদি, দুলালের ভাবনা ভাবিয়া ভাবিয়া, আমার মনে যে কতখানা ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। যখনই তার কথা ভাবি, কত-রকম-কি অমঙ্গল ভাব মনে জাগে! রাত্রে, নানারকম দুঃস্বপ্ন দেখি। বুঝি দিদি, দুলাল আমার আর বাঁচিবে না!”

বলিয়া অভাগিনী, অঞ্চল দ্বারা, দুই ফোঁটা চক্ষের জল মুছিল।

করুণা, অন্তরে সমবেদনা পাইয়াও, বাহিরে সে ভাব গোপন করিলেন। গোপন করিলেন,—পাছে, কোমল-প্রাণা কমলা, ভগ্ন-মনা—ভগ্ন-প্রাণা হইয়া পড়ে। তিনি ঈষৎ ভ্রুকুটী করিয়া, তিরস্কারচ্ছলে, কহিলেন,—“একি বোন্, তুমি,—কোথাও কিছু নাই—এমন অমঙ্গল কথা মুখে আন কেন? ছিঃ! ইহাতে যে দুলালের অকল্যাণ হয়! পুরাণে পড় নাই কি, দিন-রাত অশুভ চিন্তা করিলেই, ঠিক সেই অমঙ্গলটি, আগে আসে? বালাই,—দুলের আমার শতবর্ষ পরমায়ু হোক।”

হিতার্থিনীর মুখে অভয়-আশ্বাসের কথা শুনিয়া, কমলা কিছু আশস্থা হইলেন। করুণা মধ্যে মধ্যে প্রায়ই, কমলাকে এইরূপে সান্ত্বনা করিতেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে আরও কিছুদিন কাটিয়া গেল। দুলালী, পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। এখন সৌন্দর্য্য-প্রতিমার শোভা অতুলনীয়া। যেন স্বচ্ছ সরোবরে, শ্বেত-শতদল বিরাজ করিতেছে। বালিকার ক্ষুদ্র-দেহে রূপ আর ধরে না। বেগবতী স্রোতস্বতীর ন্যায়, তাহা সদাই চল-ঢল করিয়া, কূলে কূলে উছলিয়া পড়িতেছে। কন্যা, ক্রমেই বয়স্থা হইতেছে দেখিয়া, কমলা যার-পর-নাই উতলা হইয়া পড়িলেন। ভাবিয়া ভাবিয়া, তাঁহার সোণার অঙ্গ কালী হইতে লাগিল। কিন্তু তিনি স্ত্রীলোক,—কি করিতে পারেন?

একদিন ত্রিবক্র, বাটী আসিলে, কমলা, অতি বিনীতভাবে কহিলেন,—“স্বামিন্! দুলালের বিবাহ-বিষয়ে কি করিলে? আর ত ভাল

দেখায় না। শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, দুলাল-আমার পনরয় পা দিয়াছে। বাছার মুখের দিকে, এখন আর চাওয়া যায় না।"

ত্রিবক্র, তাহার স্বাভাবিক-কর্কশ-কণ্ঠে কহিল,—"তা হ'য়েছে কি? তুমি যখন-তখন, কেন এ কথা বল? আমার মেয়ের ভাল-মন্দ, আমি বুঝি না? তুমি মেয়ে মানুষ,—মেয়েমানুষের মত থাকিবে। তোমার, অত-শত কথায় কাজ কি? বৃহস্পতিকে, জ্ঞান দিতে এস নাকি?"

কমলা, ভক্তিমাখা করুণস্বরে উত্তর করিলেন,—"না স্বামিন, তা নয়। তুমিই আমার বুদ্ধি, তুমিই আমার জ্ঞান,—তোমাকে কি আমি জ্ঞান দিতে পারি? তবে কি না,—হিঁদুর ঘরে এতবড় আইবুড় মেয়ে রাখিলে, বাপ-মায়ের পাপ হয়। ইহা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দুয়েই দোষ। তাই তোমাকে—"

"হাঁ, তাই আমাকে যখন-তখন লেক্‌চার দিতে এস! কেমন, না? এইজন্যই ত আমি মেয়ে-ছেলেকে, পড়াশুনা করিতে দিতে নারাজ!—কেবল কতকগুলা জ্যেঠামি কথা শিখে মাত্র।"

আজ অল্পে অল্পে এই পর্য্যন্ত হইয়া গেল।

আর একদিন কমলা, স্বামীকে পুনরায় অতি নম্রভাবে কহিলেন,—"আজ আবার তোমায় সেই কথা ব'লে জ্বালাতন করতে এসেছি। স্বামিন্, কথাটি রাখিবে কি?"

"কি?" পতিব্রতার প্রতি, পাপিষ্ঠ সদাই উগ্রমূর্ত্তি; সেই ভাবে, কর্কশকণ্ঠে কহিল,—"কি? দুলালের বিবাহের কথা ত?"

কমলা, নতমুখে, হাতের বালা গাছটির মুখ খুঁটিতে খুঁটিতে কহিলেন,—"হাঁ, সেই কথাই বলিতেছি। স্বামিন্, এখন আর আমার অন্য চিন্তা নাই। দুলালের কথাই এখন আমার ধ্যান-জ্ঞান হইয়াছে। মেয়ের মুখের দিকে, আমি আর চাহিতে পারি না। আমরা স্ত্রীলোক,—মেয়েছেলের মনের ভাব সব বুঝিতে পারি। বাছার মনোভাব কি, আমি বুঝিয়াছি।"

"কি বুঝিয়াছ?"

কমলা একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন,—"সে কথা আর তোমায় কি বলিব, বল।"

"না,—তা বলিবে কেন। দেখ, আমি তোমায় পরিষ্কার রকমে বলছি, —আমার সাম্‌নে পুনরায় ও-সকল কথা উত্থাপন ক'র না।"

কথায় কথা বাড়িল। কমলা অবশ্যই তাঁহার সেই স্বাভাবিক কোমল স্বরে, বিনীতভাবে কথা কহিতে লাগিলেন। কিন্তু পাপিষ্ঠ স্বামী, উত্তরোত্তর অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। স্বাভাবিক কর্কশকণ্ঠ আরও কর্কশ করিয়া কহিল,—"এখান থেকে তুই দূর হ'। আমার মেয়েকে আমি চিরকাল আইবুড় রাখ্‌ব। তুই কথা কবার কে?"

পতিব্রতা, নীরবে, দুই ফোঁটা চক্ষের জল মুছিলেন। কিছুক্ষণ পরে, আবার গদ্গদ ভাবে কহিলেন,—"স্বামিন্, সাত নয়, পাঁচ নয়,—তোমার ঐ একটি মেয়ে; ঈশ্বরেচ্ছায়, দশটাকা খরচও করিতে পারিবে। তবে, শুভকার্য্যে, কেন এত ইতস্তত করিতেছ?"

বলিয়া, পতিব্রতা সাধ্বী, ভক্তিভরে, স্বামীর চরণ-যুগল, বক্ষে ধারণ করিল, একটু কাঁদিল কাঁদিতে কাঁদিতে একটু অভিমান ভরে, কতক আবেগভরে কহিল,—"স্বামিন্! তোমার পায়ে পড়ি, এই মাসের মধ্যেই তুমি, যা-হয়-একটা শেষ কর। এ তোমার করিতেই হইবে। মেয়ের মুখের দিকে, আমি আর চাহিতে পারি না। দেখ, এই রকম আইবুড় মেয়ে ঘরে রাখা, লোকতঃ ধর্ম্মতঃ দুয়েই দোষ। লোকে, দুলালের কথা লইয়া হাসে, কাণাকাণি করে; কেহ-কেহ না তোমার ও রাজা-জমিদারের প্রসঙ্গ তুলিয়া, নানারকম কুৎসিত বিষয়ের আলোচনা করে। স্বামিন্, বলিব কি,—সে সব কথা শুনিয়া, আমার বুকে যেন শেল বাজে!"

বলিতে বলিতে একটু-অধিক আবেগভরে, পতিব্রতা সাধ্বী, পুনরায় কহিলেন,—"স্বামিন্! দোহাই তোমার,—তুমি ও পাপ-সঙ্গ ত্যাগ কর; ধর্ম্মে মতি দাও! তোমার সুমতি হইলে, সকল দিক রক্ষা হয়। নহিলে, বিধাতা বুঝি, দুলালের ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন না।"

এই বলিতে বলিতে পতিব্রতার চক্ষে জল আসিল। মনোবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, তিনি, স্বামীর পদদ্বয়ে মুখ লুকাইয়া, অস্ফুট-স্বরে, গুমরিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মের নামে, ত্রিবক্র ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইল। পতিব্রতা

সহধর্ম্মিণীর মুখে এই কয়েকটী মাত্র কথা শুনিয়া, পাপিষ্ঠ, চক্ষের নিমিষে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান—সকলই যেন, জীবন্তভাবে, নখদর্পণে দেখিতে পাইল। সতী-বাক্যে, তাহার হৃদ্-তন্ত্রী, কাঁপিয়া উঠিল। অনেক দিনের অনেক কথা, এককালে বিদ্যুদ্বেগে, তাহার স্মৃতিপথে জাগরূক হইল। তাহার হৃদয়ের নিভৃতদেশ স্পর্শ করিয়া, কে যেন, প্রাণের কথা টানিয়া বাহির করিল। পাপিষ্ঠ অমনি, দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হইয়া, সতী-নারীর প্রতি গর্জ্জিয়া উঠিল। সবলে, সক্রোধে, পদদ্বয় ছিনাইয়া লইয়া, সেই লক্ষ্মী-স্বরূপিণী কমলার বক্ষে, মর্ম্মান্তিক পদাঘাত করিল! সে আঘাতে, অভাগিনী, ছিন্ন কদলী-বৃক্ষের ন্যায়, ভূমে নিপাতিত হইল। পাপিষ্ঠ স্বামী, সক্রোধে, কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল,—"দূর হ! আমার সম্মুখে আসিবি ত, মারিয়া ফেলিব। এত বড় স্পর্দ্ধা! তুই আমাকে, ধর্ম্মের ভয় দেখাইতে আসিয়াছিস্!"

স্বর্ণপ্রতিমা, সাধ্বী-রমণী, বুকের ব্যথা বুকে চাপিয়া, অতি কষ্টে উঠিয়া, গললগ্নীকৃতবাসে, ভক্তি-গদ্গদ-কণ্ঠে কহিল,—"স্বামিন্, একি কথা কহিতেছ! তুমিই আমার ধর্ম্ম, তুমিই আমার ঈশ্বর! আমি, আর অন্য ধর্ম্ম জানি না। তোমাকে ধর্ম্মের ভয় দেখাইব! ইহা কি সম্ভব? হাজার হৌক, "আমরা বোকা মেয়ে-মানুষের জাত," তাই "সকল কথা গুছাইয়া বলিতে পারি নাই,—কি বলিতে কি বলিলাম!"

অতঃপর স্বামীর পায়ে হাত বুলাইয়া কহিলেন,—"তোমার পায়ে কি লাগিয়াছে?"

পাপিষ্ঠ স্বামী, তর্জ্জন-গর্জ্জন করিয়া কহিল,—"না—লাগে নাই। তুই এখন এখান হইতে দূর হ! কমলা ক্ষুন্নমনে, কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। যাইবার সময়, মনে মনে কহিলেন,—"হরি, দয়াময়! স্বামীর-আমার, এ কি করিলে? দয়াল ঠাকুর! কত দিনে, দাসীর প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিবে!"

পার্শ্বে, অন্য প্রকোষ্ঠে, দুলালী ঘুমাইতেছিল। এই সময়ে, কি-একটা ভীষণ স্বপ্ন দেখিয়া, সে, কাঁদিয়া উঠিল। ঘুম-ঘোরে জড়িত-স্বরে, সবিস্ময়ে কহিল,—"মা, মা! আমার কপাল-দোষে, সত্য সত্যই কি, শেষে, তোমার কথা ফলিল?"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

নিদ্রাভঙ্গের পর, অপরাহ্নে, দুলালী, মুখখানি কিছু ভার-ভার করিয়া, বাতায়ন-পার্শ্বে বসিয়া, কি চিন্তা করিতেছে। সেই অনির্ব্বচনীয়, সরল মুখারবিন্দে, দুশ্চিন্তার ছায়া পতিত হওয়ায়, তাহা ঈষৎ পাংশুবর্ণ ধারণ করিয়াছে। যেন স্বচ্ছ-সলিলস্থ বিকশিত শতদলে একটা ঝঞ্ঝাবাত হইয়া গিয়াছে। অবেণী-সম্বদ্ধ ভ্রমরগঞ্জিত কেশরাশি, সর্ব্বাঙ্গে নিপতিত হইয়া, অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদন করিতেছে। সেই লাবণ্যময় বামগণ্ডে, ক্ষুদ্র কর-পল্লব খানি রাখিয়া, বালিকা, গভীর চিন্তায় নিমগ্না আছে। অনেক-ক্ষণের পর, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, মনে মনে কহিল,—"হায়, কেন এমন দুঃস্বপ্ন দেখিলাম? সত্য সত্যই কি শেষে, অদৃষ্টে এরূপ ঘটিবে? ভগবান, তবে কেন আমায় সংসারে পাঠাইয়াছিলে?"

এই কথা বলিতে বলিতে, বালিকার চক্ষে জল আসিল। এমন সময়, কমলা, ধীরে ধীরে সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন। কন্যাকে, এরূপ অবস্থায় দেখিয়া, করুণকণ্ঠে কহিলেন,—"একি, মা দুলাল্! এমন অ-বেলায়, এখানে, এমন করিয়া বসিয়া আছ কেন? ওকি মা, চক্ষে যে জল দেখিতেছি! কি হইয়াছে, দুলাল্?"

বলিয়া স্নেহভরে, কন্যার অঙ্গে, পদ্ম-হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগি-লেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি ভাবিতেছিলে, মা আমার?" অতঃপর মনে মনে কহিলেন,—"আহা, বাছা রে, তোর ভাবনায়, আমার প্রাণও, কণ্ঠাগত হইয়াছে।"

সুকুমারী কন্যা, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল,— "না মা, এমন কিছু নয়,—একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া, মনটা কেমন খারাপ হইয়া গিয়াছে। তাই একটু ভাবিতেছিলাম! আচ্ছা মা, সব স্বপ্ন কি ফলে?"

কমলা, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া মনে মনে কহিলেন,— "কপাল-গুণে, এক আধটা, ফলে বৈকি মা! আমি স্বপ্ন বিশ্বাস করি। আর, ইহাও বিশ্বাস করি যে, অদৃষ্টের ফলাফল জানিবার জন্য, ভগবান পূর্ব্ব হইতে, স্বপ্নাবস্থায়, আভাষে, মানুষকে সতর্ক বা অভয়দান করেন।"

প্রকাশ্যে, এ ভাব গোপন করিয়া কহিলেন,—"না,—স্বপ্ন কিছু নয়,—উহা মনের বিকার মাত্র। যে ভাবনাটা অধিকক্ষণ করা যায়, ঘুমের সময়, সেটা বিকৃতিভাব ধারণ করে। তুমি আর দিনের-বেলায় ঘুমাইও না। কি রকম স্বপ্ন দেখিয়াছ, বল দেখি!"

দুলালী, আবার একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"সবটা মা, আমার মনে নাই। আব্ছায়ার মত, যে টুকু মনে আছে, বলিতেছি।"

"বল মা, শুনি। ভয় কি?" বলিয়া কমলা, কন্যার পার্শ্বে উপবেশন করিলেন এবং স্নেহ-ভরে, তাহার গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

দুলালী, পুনরায় একটী দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"মা, সে কথা মনে হইলেও, আমার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। আমি বেশ ঘুমাইতেছি, এমন সময় দেখিলাম,—যেন বিকটাকার দৈত্যের মত একটা মানুষ আসিয়া, আমাকে দৃঢ়রূপে, তাহার বুকের মধ্যে পুরিল এবং হাসিতে হাসিতে, দ্রুতপদে, কোথায় লইয়া চলিল। তাহা দেখিয়া, ভয়ে আকুল হইয়া, আমি, গলা ছাড়িয়া কাঁদিতে লাগিলাম। ইহাতে সেই বিকট পুরুষ অধিক ক্রুদ্ধ হইয়া, কাপড় দিয়া, একে একে আমার হাত, পা, মুখ, চোক সব বাঁধিয়া ফেলিল। তাহাতে আমার শ্বাসরোধ হইতে লাগিল। তখন আমি, হাঁপু ছাড়িয়া, আর কাঁদিতেও পারি না। একরূপ, অচৈতন্য হইয়া পড়িলাম। তারপর যে, কতরকম-কি ভয়-বিভীষিকা দেখিলাম, তাহা বলিতে পারি না। সে সব ভয়ানক দৃশ্য, কল্পনায়ও আনা যায় না, মা! এরূপ অবস্থায় যে, কতক্ষণ কাটিয়া গেল, তাহা আমার মনে নাই। যখন আমার জ্ঞান হইল, তখন দেখি, এক নিবিড় জঙ্গলে আসিয়াছি। আমি কাঁদিতে কাঁদিতে ব্যাকুলভরে কহিলাম,—'আমায় কোথায় লইয়া যাইতেছ?—আর তোমার প্রয়োজনই বা কি?' তাহাতে সে, খল খল রবে হাসিতে লাগিল এবং আমায় নানারূপ অশ্লীল কথা বলিতে লাগিল। তারপর মা, আমায় লইয়া, প্রকাণ্ড এক পাহাড়ের উপর তুলিল। আমি, ভয়ে, আরও কাঁদিতে লাগিলাম। শেষে, সেই উচ্চ পাহাড় হইতে, আমাকে ফেলিয়া দিল। আমি, "মা গো, মা গো" বলিয়া, যেমন

কাঁদিয়া উঠিব, অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল! দেখি, চক্ষের জলে, বিছানার চাদর-বালিস্ সব ভিজিয়া গিয়াছে, আর আমি অত্যন্ত ঘামিয়া পড়িয়াছি। মা, এই দুঃস্বপ্ন দেখিয়া অবধি, আমার মনে যে কতখানা ভাবের উদয় হইতেছে, তাহা বলিতে পারি না।"

এই বলিয়া বালিকা, আবার একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল, এবং অঞ্চল দ্বারা চক্ষু দুইটি পরিষ্কার করিল।

কমলা, এতক্ষণ নির্ব্বাক—নিস্পন্দ হইয়া, একাগ্রচিত্তে, কন্যার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শুনিতেছিলেন। এইবার, একটি গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া, মনে মনে কহিলেন,—"আমার যে কপাল ভাঙ্গিয়াছে, তাহা অনেকদিন জানি। দুলালের অদৃষ্টে, বিধাতা যে, কোন দারুণ দুর্ঘটনা লিখিয়াছেন, তাহা বেশ বুঝিতে পারিতেছি। নারায়ণ, তোমার মনে এই ছিল!"

প্রকাশ্যে, কন্যার চিবুকখানি ধরিয়া, স্নেহভরে কহিলেন,—"ইহাতে আর ভয় কি মা! স্বপ্নে, লোকে এমন কত-কি দেখে! স্বপ্ন যদি সত্য হইত, তাহাহইলে আর ভাবনা ছিল কি! অনেক দীন-দুঃখী রাতারাতি বড়মানুষ হইতে পারিত। তবে, দুঃস্বপ্ন দেখিলে, মনটা একটু খারাপ হইয়া যায় বটে। তা মা, তুমি আর ও সব কথা কিছু ভেব না। যত ভাবিবে, মন তত খারাপ হইতে থাকিবে। এস মা, এখন তোমার চুল বেঁধে দিই। রাত্রে, আহারাদির পর, তোমায়, 'ভাগবত' পড়িয়া শুনাইব; তাহাহইলে, আর কোন দুশ্চিন্তা থাকিবে না।"

মা ও মেয়ে, কক্ষান্তরে প্রস্থান করিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার কয়েক দিন পরে, একদিন প্রাতে, কমলা প্রাতঃস্নান করিয়া, পট্টবস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক, ফুল-বিল্বদল লইয়া, শিব-মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। বাসন্তীপুরে, গঙ্গার ঘাটে, স্ত্রীলোকদিগের স্নানাগারে, এই মন্দির স্থাপিত। কমলা ভক্তিভরে, গললগ্নীকৃতবাসে, সাষ্টাঙ্গে, শিব-লিঙ্গকে প্রণাম করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে মনে মনে কহিলেন,—"হে

দেবদেব মহাদেব, হে আশুতোষ! আমার স্বামীর প্রতি প্রসন্ন হও, তাঁহাকে সুমতি দাও। তোমার দয়ায় কি না হইতে পারে, দয়াময়! পার্ব্বতীনাথ! এ অবলাকে কূল দাও!”

বলিয়া পুনরায় ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন। অতঃপর অঞ্জলি ভরিয়া, স-চন্দন ফুল-বিল্বদল লইয়া, আবার মনে মনে কহিলেন,—“হে শঙ্কর! হে ত্রিলোচন! আজ আমি একটী মানস করিয়া আসিয়াছি, তাহার পরীক্ষা করিব। মঙ্গলময়! আজ তোমার পদাশ্রিতা দাসীর মুখ রেখ’। যদি কায়-মনঃ-প্রাণে তোমার শ্রীচরণ সেবা করিয়া থাকি, তবে যেন মানসচক্ষে, আজ একটী ভবিষ্যৎ-দৃশ্য দেখিতে পাই! অন্তর্যামি! অন্তরের কথা প্রকাশ করিব না,—আজ এ দাসীর অন্তরে পূর্ণরূপে আবির্ভূত হইয়া, ভক্তি-পরীক্ষা গ্রহণ কর! ইচ্ছাময়, শুভাশুভ তোমার ইচ্ছা! আমার এ মানস, সফল হইবে কি না, প্রত্যক্ষরূপে দেখাইয়া দাও!”

এই বলিয়া ভক্তিমতী কমলা, সেই অঞ্জলিপূর্ণ সচন্দন-পুষ্প-বিল্বদল লইয়া, মনে মনে অনেকক্ষণ জপ করিলেন। পরে চক্ষু উন্মীলন করিয়া, ভক্তি-গদ্গদস্বরে, কম্পিতকণ্ঠে কহিলেন,—“পার্ব্বতীনাথ, দাসীর মানসিক গ্রহণ কর!”

এই বলিয়া, নতজানু হইয়া, সেই অঞ্জলিপূর্ণ সচন্দন-পুষ্প-বিল্বদল, শিবলিঙ্গোপরি স্থাপিত করিলেন। পরে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া, যেমন উঠিয়া বসিবেন,—হরি হরি হরি! ! !—এ কি হইল!—কমলা দেখিলেন, সেই সচন্দন-পুষ্প-বিল্বদল, শিবলিঙ্গ হইতে, এককালে, ভূমে নিপতিত হইল। তিনি বুঝিলেন, তাঁহার মানস সফল হইবে না,—অপিচ, ঘোর অমঙ্গল ঘটিবে! বুঝিলেন, এত স্তব-স্তুতিতেও, দেবতা প্রসন্ন হইলেন না। নিমেষমধ্যে তিনি, ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এককালে দেখিতে পাইয়া, ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার সংজ্ঞা লোপ হইয়া আসিতে লাগিল। অমনি, “মা দুলাল রে, তোর কি হ’বে রে!” পাষাণভেদী করুণকণ্ঠে, এই কয়েকটি কথা বলিতে বলিতে, কমলা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন।

কন্যা দুলালী, এই সময়ে ছাদের উপর দাঁড়াইয়া কি ভাবিতেছিল।

একটা চিল, বায়ুস্তরে উড়িতে উড়িতে, ধাঁ করিয়া, তাহার মুখে, পাক্‌সাট মারিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে বালিকার মুখখানি ক্ষত-বিক্ষত হইয়া, রক্ত পড়িতে লাগিল।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে, ব্যথার ব্যথী করুণাকে, কমলা একে একে সকল কথা বলিলেন। কন্যার অভাবনীয় স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ও শিব-সন্নিধানে নিজ 'মানসিক' পরীক্ষার কথা আদ্যোপান্ত কহিয়া, তিনি বুঝাইলেন যে, দুলালের [প]রিণাম ভাল নহে,—তাহার অদৃষ্ট বড় মন্দ। করুণাও মনে মনে [স]মস্ত বুঝিলেন। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া প্রকাশ্যে কহিলেন,—"[ছি]ঃ বোন্, তুমি অত উতলা হও কেন? আর সর্ব্বক্ষণ বা এ রকম অশুভ-চিন্তা কর কেন? তুমি বুদ্ধিমতী, তোমাকে আর আমি অধিক বুঝাইব কি! স্বপ্ন যদি সত্য হইত, তাহাহইলে, আর ভাবনা ছিল না। তবে বলিবে, তোমার মানসিক পরীক্ষায় অশুভ ফল পাইয়াছ। তা এমন হয়।—মনের চাঞ্চল্যবশতঃ, অনেক সময়, হিতে বিপরীত বোধও হয়। তুমি কি দেখিতে কি দেখিয়াছ!"

কমলা, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, একটু দুঃখের হাসি হাসিয়া কহিলেন,—"দিদি! তুমি আমাকে বৃথা সান্ত্বনা করিতেছ। আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি, বাবা পার্ব্বতীনাথ, দাসীর অর্ঘ গ্রহণ করেন নাই। দিদি, বেশ বুঝিতে পারিয়াছি, আমার কপাল পুড়িয়াছে! নহিলে, আমার প্রাণ কাঁদিবে কেন?"

"তা এমন হয়। আপনার জনের অশুভ চিন্তা করিলেই, মন এই রকম খারাপ হইয়া থাকে। আবার ঐ চিন্তা ভাল দিকে লইয়া যাও দেখি, মন এখনই প্রফুল্ল হইবে।"

"না দিদি, তা নয়। তুমি আমাকে প্রবোধ দিবার চেষ্টা করিতেছ; কিন্তু আমার বুক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, মন প্রবোধ মানিবে কেন? তুমি ভাবিতেছ, সত্য কথা কহিলে, আমি আরও অধৈর্য্য হইয়া পড়িব। কিন্তু

দিদি, এ পোড়া প্রাণে অনেক সহিয়াছে, অনেক সহিতেছে ;—আমি পাষাণে বুক বাঁধিয়াছি,—আর অধৈর্য্য হইব কেন? তোমার মনের কথা, অকপটে বল দিদি।”

সহৃদয়া করুণা মানস-দর্পণে, সরলা কমলার প্রকৃতিখানি দেখিয়া লইলেন। দেখিলেন,—তাঁহার হৃদয় ঘোর তমসাচ্ছন্ন; এই অমঙ্গল সংস্কারটি, তথায় বদ্ধমূল হইয়া বসিয়াছে। হৃদয়ের অন্তস্তল ভেদ করিয়া, যে ভাবটি উদয় হয়, কিছুতেই তাহার রূপান্তর ঘটে না। তথাপি তিনি আত্মগোপন করিলেন। কহিলেন,—“কমল, তুমি বুদ্ধিমতী; তবে কেন এমন অমঙ্গল চিন্তা কর বোন্?”

কমলা, চক্ষের জল মুছিয়া কহিলেন,—“দিদি, যদি একটি মাত্র অমঙ্গলের কারণ হয়, তাহাহইলে, মন প্রবোধ মানিতে পারে। কিন্তু দিদি, আমি কোন দিক্ ছাড়িয়া, কোন দিক্ দেখিব? প্রথম দেখ, দুলাল্ আমার শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, পনরয় পা দিয়াছে; এত বড় আইবুড় মেয়ে, আর কা'র ঘরে আছে বল দেখি? তারপর দেখ, আমি আজ কয় মাস ধরিয়া, কেবলই দুঃস্বপ্ন দেখিতেছি। আর মা-আমার, যে রকম ভয়ানক স্বপ্ন দেখিয়াছে, তাহা মনে করিলেও গায়ে কাঁটা দেয়! বিশেষ, ঠিক ঐ দিন আমি আবার, স্বামীর সহিত দুলালের বিবাহের কথা পাড়িয়াছিলাম। সে সময় এ হতভাগিনীর কাল-মুখ থেকে, একটা অমঙ্গল কথাও বাহির হইয়াছিল। তাহাও য় উপেক্ষা করিলাম; কিন্তু—

বলিতে বলিতে, কমলার সর্ব্ব শরীর কাপিয়া উঠিল, চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইয়া আসিল। তিনি বিহ্বল-চিত্তে, পুনরায় কহিলেন,—“কিন্তু আজ যে, মহা অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহাতে আমার সকল আশা-ভরসা লোপ পাইয়াছে। জান ত, বাবা পার্ব্বতীনাথ কিরূপ জাগ্রত! ভক্তি-ভরে, একমনে যে যা জানিতে চায়, তিনি প্রত্যক্ষরূপে, তাহা দেখাইয়া দেন। দিদি, বেশ বুঝিয়াছি, আমার কপাল ভাঙ্গিয়াছে। আবার ঠিক সেই সময়, কোথা হইতে একটা পোড়া চিল আসিয়া, মার-আমার মুখখানি ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দিয়া গেল। মেয়ের অদৃষ্টে যে, শীঘ্রই একটা মহা-অমঙ্গল ঘটিবে, তাহা প্রতিপদেই দেখিতে পাইতেছি।”

এই বলিয়া, তিনি, দুলালের মুখে, চেলের পাকসাট মারিবার বৃত্তান্ত, আদ্যোপান্ত কহিলেন। পরে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া আবার বলিতে লাগিলেন,—"দিদি, প্রতিপদেই যখন এত অমঙ্গল দেখিতে পাইতেছি, তখন আর দুলালের-আমার ভালর লক্ষণ কৈ? আর তাঁর ভাবনা ভেবে-ভেবে, আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে। হায়, প্রতিদিন কত লোকের যে, কত রকমে নিশ্বাস পড়িতেছে, তাহার সীমা নাই। দিদি, এ পোড়া প্রাণ অনেক সহিয়াছে, অনেক সহিতেছে; কিন্তু আর বুঝি সহে না। ভগবান কি তাই করিবেন!" বলিয়া, কমলা একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

করুণা একে একে সকল কথা শুনিলেন। মনে মনে সকলই বুঝিলেন। বুঝিলেন, কমলার আশঙ্কা, একবারে অমূলক নহে। কিন্তু তথাপি, তিনি, অন্তরে এ ভাব গোপন রাখিয়া, প্রকাশ্যে, একটু তিরস্কার-চ্ছলে কহিলেন,—"কমল, তুমি দেখিতেছি, ক্ষেপিয়া উঠিলে! এখন বুঝি, এই রকম অমঙ্গল চিন্তাই, তোমার ধ্যান-জ্ঞান হইয়াছে? ছিঃ বোন্!—তুমি বুদ্ধিমতী হ'য়ে এমন অবুঝের ন্যায় হও কেন, বুঝিতে পারি না।"

কমলা কিছু ভগ্নস্বরে কহিলেন,—"না দিদি, বাবা-পার্ব্বতীনাথের মাথায় যখন ফুল-বিল্বপত্র স্থান পায় নাই, তখনই বুঝিয়াছি, আমার সকল আশা-ভরসা লোপ পাইয়াছে! দুইদিন পরে যাহা ঘটিবে, তাহা আমি এখনই প্রত্যক্ষ করিতেছি। এখন দিদি, তোমরা আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাহার পূর্ব্বে, এ হতভাগিনীকে, এ পৃথিবী ত্যাগ করিতে হয়!"

"ষাট্! তুমি কোথায় যাইবে বোন্?"

বলিয়া স্নেহভরে, করুণা, কমলার চিবুকখানি ধরিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"মা সর্ব্বমঙ্গলে, কমলার দুঃখ দূর কর মা!"

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে, আহারাদির পর, ত্রিবক্র, শয্যার উপর অর্দ্ধশয়নাবস্থায়, কি চিন্তা করিতেছে। এমন সময় কন্যা দুলালী তথায় প্রবেশ করিল। সরলা কন্যার চাঁদমুখখানি দেখিয়া, হতভাগ্য, ক্ষণকালের জন্য, তৃপ্তিলাভ করিল। মুহূর্ত্তকালের জন্য, তাহার অন্তরের পাপরাশি বিদূরিত হইয়া গেল। স্নেহভরে, প্রীতি-প্রফুল্ল-আননে কহিল,—"মা দুলাল্! এস,—এখানে ব'স মা!"

দুলালী, পিতার পার্শ্বে উপবেশন করিল। একটু ইতস্ততের পর কহিল,—"বাবা!——"

আহা, সে স্বর কি মধুর! ত্রিবক্রের পাষাণ-হৃদয়, তাহাতে দ্রব হইয়া গেল। হতভাগ্য মুহূর্ত্তকালের জন্য ইহসংসার ভুলিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতে লাগিল। কপটতা, নিষ্ঠুরতা, ক্ষণকালের জন্য, তাহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল। ত্রিবক্র, অনিমেষ নয়নে, কন্যার মুখপানে চাহিয়া রহিল। বালিকা কহিল,—"বাবা, তোমায় যখন-তখন এত চিন্তিত দেখি কেন? মনে যেন একটুও সুখ নাই। কি ভাব, বাবা?"

ত্রিবক্র একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"না মা,—ও কিছু নয়। তুমি একটু ভাগবত পড়, আমি শুনি।"

ত্রিবক্র, একেবারে নীরেট মূর্খ ছিল না। বাঙ্গালা লেখা-পড়া, সে, কতক কতক জানিত ও বুঝিত। ইহা ব্যতীত ধর্ম্মের অনেক নিগূঢ় কথা, কি জানি, সে কোথায় শিখিয়াছিল। তাই, পাপ-পঙ্কে মাখামাখি হইয়া, যখন হৃদয় জ্বলিয়া-পুড়িয়া খাক্ হইতে থাকিত, তখন সে, মধ্যে মধ্যে বাটী আসিয়া, প্রাণাধিকা কন্যার মধুমাখা কথা শুনিত ও তাহার সরলতাময় চাঁদমুখে, ভাগবত পুরাণাদির মহা মহা কথা শুনিয়া, ক্ষণকালের জন্য, প্রাণের দারুণ জ্বালা জুড়াইত। এই করুণাময়ী কন্যাই, তাহার সংসারের একমাত্র বন্ধন!

সুকুমারী দুলালী, ভাগবত-পাঠ আরম্ভ করিল। সেই অনির্ব্বচনীয় শান্ত-করুণ-রসপূর্ণ ভক্তি-তত্ত্ব অধ্যয়ন করিতে করিতে, বালিকার সর্ব্ব-শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। বদনমণ্ডলে প্রকৃত ভাবগ্রাহিতার

পরিচয় প্রকাশ পাইল। প্রতি পূর্ণচ্ছেদে, প্রতি পদ উচ্চারণে, প্রতি পংক্তি পাঠে, বালিকার কণ্ঠে বীণা-ঝঙ্কারবৎ মধুর-ধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল। একে মাধুর্য্যময়ীর মধুর কণ্ঠস্বর, তদুপরি বৈষ্ণবের সর্ব্বস্বধন—ভগবান্ বাসুদেবের মাহাত্ম্য-বর্ণনময় পরম ভক্তিগ্রন্থ ভাগবত-পাঠ, যেন মণি-কাঞ্চনে যোগ হইল। দুলালীর সুললিত অধ্যয়ন-নৈপুণ্যে, গ্রন্থের দুর্ব্বোধ্য অংশগুলিও, সুপরিস্ফুট হইতে লাগিল। যেন শতদলাসনে মূর্ত্তিমতী বীণাপাণি অধিষ্ঠিত হইয়া, তন্ময়ভাবে, বেদাধ্যয়নে রত হইয়াছেন!

ত্রিবক্র, কতক শুনিল, কতক শুনিল না। ভাগবতের প্রতি, তাহার চিত্ত, যত আকর্ষণ করুক বা না করুক, সুকুমারী কন্যার মুখপানে, সে, অনিমিখ-নয়নে চাহিয়া রহিল। যতক্ষণ না পুস্তকপাঠ বন্ধ হইল, ততক্ষণ সে, চিত্রার্পিতের ন্যায়, স্থিরভাবে অবস্থান করিয়া রহিল। কন্যার সে সরলতাময় মুখারবিন্দ, ত্রিবক্র যতই দেখে, ততই তাহার দর্শন-পিপাসা বলবতী হয়। এইরূপ দেখিতে দেখিতে, স্নেহরসে, তাহার লোহ-হৃদয় দ্রব হইয়া গেল; চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইল; মনে হইল,—"পৃথিবীর কোন্ স্থানে কি দ্রব্য আছে,—যাহার বিনিময়ে, আমার এ জীবনসর্ব্বস্ব, প্রাণাধিকা কন্যারত্ন সমর্পণ করিতে পারি! না, না, এ অপার্থিব ধন, প্রাণ থাকিতে আমি, পরকে বিলাইয়া দিতে পারিব না! ইহাতে মা-আমার আজীবন কুমারী-অবস্থায় থাকে, সেও ভাল!"

পুস্তকপাঠ সাঙ্গ হইলে, দুলালী, স্নেহমাখা কণ্ঠে কহিল,—"বাবা, কেমন শুনিলে? তোমার মন সুস্থ হইয়াছে ত?"

ত্রিবক্র, চক্ষু দুইটি পরিষ্কার করিয়া কহিল,—"হাঁ মা, তোমার মধুমাখা কথাতেই, আমার প্রাণ শীতল হইয়াছে।"

এই বলিয়া, কন্যার চিবুকখানি ধরিয়া, পুনরায় স্নেহভরে কহিল,—"মা, তুমি চিরদিন আমার কাছে থাকিবে! কেমন, মা!"

দুলালী, এ কথার কোন উত্তর না দিয়া, মুখখানি নত করিয়া রহিল। পরে কহিল,—"আচ্ছা বাবা, কৃষ্ণ এমন বস্তু, তবে কেন সকলের কৃষ্ণে ভক্তি হয় না?"

প্রিয়তমা কন্যার নিকট, ত্রিবক্রের প্রকৃতি স্বতন্ত্র। এখন যেন, সে ত্রিবক্র নহে। ত্রিবক্র কহিল,—"যে যেমন মন লইয়া, সংসারে জন্মগ্রহণ

করে, সে, সেইমত ফল পায়। ভক্তি বড় উচ্চ জিনিস। যা'র তা'র ভাগে;, সে অমূল্য-নিধি মিলিবে কেন মা?"

স্নেহময়ী কন্যা জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন মিলে না বাবা?"

"জীব, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফল, ইহজন্মে ভোগ করে। সুতরাং পূর্ব্বজন্মের অনেক পুণ্যে ও সুকৃতিবলে, ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। শুধু পূর্ব্বজন্ম কেন,—জন্ম-জন্ম কঠোর তপস্যার ফলে, মানুষ, ভক্তির আস্বাদ পায়। কৃষ্ণ-ভক্তি আরও উচ্চ-বস্তু। কৃষ্ণের কৃপা ভিন্ন, কৃষ্ণ-ভক্তি লাভ করা যায় না। এমন কৃষ্ণ, যা'কে কৃপা করিবেন, তার কেমন কপাল-জোর, ভাব দেখি! সংসারে, এমন ভাগ্যবন্ত লোক কয়জন আছে মা?"

"তা বটে। কিন্তু বাবা, সকলের কৃষ্ণ-ভক্তি হইলে, সংসার কি সুখেরই স্থান হয়! কৃষ্ণ কি বস্তু, জানি না,—কেবল ছবিতে দেখেছি আর বৈ-এ প'ড়েছি,—তা'তেই এত সুখ;—না জানি, উদ্ধব বা নারদ ঋষির মত কৃষ্ণ-প্রেমে মাতুয়ারা হইতে পারিলে, আরও বা কি সুখ হয়! আচ্ছা বাবা, কৃষ্ণলাভের ফল কি?"

ত্রিবক্র, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"সাধকদের মুখে শুনিয়াছি, "কৃষ্ণলাভের ফল কৃষ্ণলাভ,—তাহার আর অন্য ফল নাই।"

ভাবময়ী কন্যা, পিতার মুখে অসীম ভক্তিতত্ত্বের কণাংশমাত্র শুনিয়া, আবেগভরে কহিল,—"আহা, বাবা! সংসারের সকল লোক যদি কৃষ্ণভক্ত হইত, তাহাহইলে সুখের সীমা থাকিত না;—এই স্থান স্বর্গে পরিণত হইতে পারিত! তাহাহইলে এত রেষারিষী, এত দ্বেষাদ্বেষী, এত হিংসা, এত রক্তপাত, এ সব কিছুই থাকিত না। সব মানুষ ভাই-ভাই; সকলেই সকলকে আত্মবৎ দৃষ্টি করে; ভগবৎ-প্রেমে সকলেই উন্মত্ত,—আহা, সে দৃশ্য কি রমণীয়,—তাহার কল্পনাতেও কি সুখ!"

বলিতে বলিতে বালিকার চক্ষে জল আসিল। ভক্তিমতী দুলালী, দ্বিগুণ উৎসাহভরে পুনরায় কহিতে লাগিল,—"আহা, বাবা! সংসারে এত রোগ শোক, পাপ তাপ, কপটতা পরপীড়ন কেন? স্বার্থের মোহে, সকলেই উন্মত্ত কেন? ইন্দ্রিয়ের তাড়নায়, মানুষ আত্মবিস্মৃত হয় কেন? দীন আতুরে দয়া, ব্যথিতে সহানুভূতি, শরণাগতকে ক্ষমা, বিপন্নের বিপদুদ্ধার, পরার্থে আত্মত্যাগ—এ সব সদ্‌বৃত্তি, সংসারে নাই কেন? বাবা,

মানুষ কেন এত অর্থপিপাসু, পরপীড়ক, অধম, পাপাচারী ও দুর্ম্মতিপরায়ণ হয়? কাহারও কি পরলোকের ভয় নাই? ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই? সংসারে, অবিরাম এ হলাহল-স্রোত উঠে কেন? মানুষের, সর্ব্বমাঙ্গল্যে বিশ্বাস নাই কেন? হায়, লোকে, তৃপ্তি ও শান্তির মাহাত্ম্য কতদিনে বুঝিবে! কতদিনে এ হাহাকার ঘুচিবে! কতদিনে এ নরকের আগুন নিবিবে? বাবা, বলিব কি, সংসারের দুঃখে, আমার প্রাণ কাঁদিতে থাকে! আমি ক্ষুদ্র বালিকা,—কোন শক্তি নাই,—তবুও বাবা, এক একবার মনে এমন ভাবের উদয় হয়, যেন ছুটিয়া গিয়া, পাপী তাপী, দীন দুঃখী, রোগী ভোগী —যে যেখানে আছে, বুক দিয়া তাহাদের উপকার করি। আহা, বাবা। সংসারে এত দুঃখ কেন?"

বলিতে বলিতে বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল।

অন্য যে-কোন লোক হইলে, ত্রিবক্র এতক্ষণ মর্ম্মান্তিক জ্বলিয়া উঠিত; কিন্তু প্রাণাধিকা কন্যার মুখে, এ উদ্দামভাবপূর্ণ কথা শুনিয়া, সে ক্ষণকালের জন্য, স্তম্ভিত হইয়া রহিল। ক্রোধের উদ্রেক হইবে কিরূপে? সে নিজেই যে, জীবনসর্ব্বস্ব তনয়াকে স্বধর্ম্মে সরলতায়, প্রেমে পবিত্রতায় দীক্ষিতা করিয়াছে। সে যে, আজীবন তাহাকে ধর্ম্মের মহিমা ও অধর্ম্মের বিষময় ফল বুঝাইয়া আসিয়াছে! "যে সকল পাপের পঙ্ক লইয়া, ত্রিবক্র সর্ব্বদা মাখামাখি করে,—ত্রিবক্রের বড় ভয় আছে, কিসে প্রাণাধিকা কন্যাকে সেই পাপ-পঙ্ক হইতে রক্ষা করিবে।" সরলা বালিকার নিকট, ত্রিবক্রের প্রকৃতি এত নির্ম্মল! হতভাগ্য এখন যেন, স্বতন্ত্র ধাতুতে গঠিত।

ত্রিবক্র দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"মা, ইহারই নাম সংসার! তুমি যাহা বলিতেছ, উহা স্বর্গের কথা! এ পাপ-সংসারে থাকিয়াও, তুমি সেই স্বর্গ-সুখ ভোগ করিতেছ! মা, আশীর্ব্বাদ করি, তোমার মনোভাব যেন, চিরদিন এইরূপ থাকে।"

অতঃপর মনে মনে কহিল,—"মা আমার নিশ্চয়ই স্বর্গভ্রষ্টা হইয়া, কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে! দুলাল্, রে! তুই আমার সংসারের একমাত্র বন্ধন! মা-আমার! প্রাণ থাকিতে তোকে, পরের করে তুলিয়া দিতে পারিব না।"

দুলালী, একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া কহিল,—"বাবা, ইহারই নাম সংসার কেন? সংসারে কি তবে দেবতা নাই? ধর্ম্ম ও পবিত্রতা নাই? মানুষ কি মায়া-মোহে এতই আচ্ছন্ন?"

ত্রিবক্র পুনরায় একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল,—"সংসারে যে ভাল লোক নাই,—এমন নহে; কিন্তু মা, তাহা অতি অল্প। সে, এত কম যে, আঙ্গুলে গণনা করা যায়।"

সুকুমারী দুলালী, একটু ক্ষুণ্নভাবে কহিল,—"এ কথা বোধ হয়, বাবা, ঠিক নয়। তুমি যাহা বলিতেছ, আমার ইচ্ছা হয়, ঠিক উহার উল্টা বলি! কিন্তু বাবা, তুমি আমার পরম-গুরু,—তোমা হইতে এ সংসার দেখিয়াছি; সুতরাং, তোমার মত-বিরুদ্ধ-বিশ্বাস, মনে স্থান দেওয়া, অধর্ম্ম মনে করি।"

চতুর ত্রিবক্রে, ধাঁ করিয়া কথাটা উল্টাইয়া লইল। উদ্‌গ্রীব ভাবে কহিল,—"হঁা মা, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই ঠিক বটে। আমিই ভুল বুঝিয়াছিলাম। সংসারে ভাল লোকের সংখ্যাই অধিক বটে।"

অতঃপর মনে মনে কহিল,—"আমার মনের বিশ্বাস আমাতেই থাক্,—সরলা কন্যার সরল বিশ্বাসে হন্তারক হই কেন? আহা, মা আমার যেন, মূর্ত্তিমতী করুণা!"

একটু ইতস্ততের পর, দুলালী মুখখানি একটু নত করিয়া, কিছু সঙ্কুচিত ভাবে কহিল,—"বাবা, যদি কোন অপরাধ না লও, তবে একটি কথা বলি।"

ত্রিবক্র, স্নেহভরে, কন্যার চিবুকখানি ধরিয়া কহিল,—"কি বলিবে মা?—স্বচ্ছন্দে বল। তোমার আবার অপরাধ কি মা!"

দুলালী, সাহসে ভর করিয়া আরও করুণ স্বরে কহিল,—"মার প্রতি তুমি এত নিদয় কেন, বাবা? আহা, মা-আমার বড় অভাগিনী! আমাকে তুমি যেরূপ ভালবাস, যে রকম স্নেহ কর, মার প্রতি তোমার সে করুণ-ভাব আদৌ দেখিতে পাই না কেন, বাবা? ভালবাসা পাওয়া দূরে থাক্,—উঠিতে বসিতে তিনি নিগ্রহ ভোগ করেন। চোকে জলে তাঁর বুক ভেসে যায়! কতদিন দেখিয়াছি, তিনি নির্জ্জনে বসিয়া কাঁদিতেছেন! আমাকে দেখিয়া, তিনি চোকের জল চোকে মারেন,—

পাছে আমি অসুখী হই। আহা, এমন করুণাময়ী মা আমার,—অকারণে তাঁর মনে কেন কষ্ট দাও, বাবা?"

"না মা,—ও কিছু নয়।"

বলিয়া ত্রিবক্র, কথাটা চাপা দিবার চেষ্টা করিল। পরে কহিল,—"তোমার নাকের একটা মুক্তা চাই, না মা? আহা, দেখ দেখি, কোথা থেকে একটা পোড়া চিল এসে, মার-আমার মুখখানি কি করিয়া দিয়া গিয়াছে! এখনও দুই একটা আঁচড়ের দাগ আছে।"

বলিয়া স্নেহভরে ত্রিবক্র, কন্যার চিবুকখানি ধারণ করিল।

বস্তুতঃ, চিলের পাকসাটে দুলালের নাকের নোলকটি ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল এবং আজিও তাহার মুখে, দু'একটা আঁচড়ের দাগ আছে। কিন্তু বালিকা, পিতার এ চাতুরীতে ভুলিল না। ঈষৎ স্মিতমুখে কহিল,—"বাবা, তুমি আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছ, কিন্তু আসল কথা আমি ভুলি নাই।"

অতঃপর একটু করুণস্বরে কহিল,—"বাবা, মার উপর তুমি একটু সদয় হও, এই আমার একান্ত ভিক্ষা। আহা, মার-মত পতিব্রতা সাধ্বী, আর কে আছে? সত্য কথা বলিতে কি, মার পুণ্যে, আমাদের আজিও কোন বিপদ হয় নাই। নহিলে,——"

বলিতে বলিতে দুলালীর চক্ষে জল আসিল; কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইল। ত্রিবক্র বাধা দিয়া কহিল,—"আচ্ছা মা, এখন হইতে তাই হইবে। তুমি অন্য কথা পাড়।"

পাপিষ্ঠ মনে মনে, কমলাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—"বটে! মেয়ের কাণে সব কথা তোলা হয়। আচ্ছা থাক্ এখন,—সময়ে বুঝিয়া লইব!"

দুলালী, দ্বিগুণ আবেগভরে, পুনরায় কহিতে লাগিল,—"বাবা, অন্য কথা আর কি পাড়িব? তুমি আমার কাছে দেখি একটি দেবতা-সদৃশ,—ধর্ম্মের কত নিগূঢ় কথা, ঈশ্বরতত্ত্বের কত মহা-মহা-কথা আমাকে শিক্ষা দেও;—কিন্তু বাবা, আর কা'রও কাছে, তোমার এ মাহাত্ম্যটুকু প্রকাশ পায় না কেন? তুমি আমাকে ধর্ম্মে দীক্ষিতা করিয়াছ, সরলতার শিক্ষা দিয়াছ;—কিন্তু বাবা, শুনিতে পাই, রাজা-জমিদারের কাছে, তাঁহার সহবাসে, তোমার মতি-গতি বিকৃত হইয়া যায়। হায়, তাহাতে কত

অভাগা-অভাগীর কপাল জন্মের-মত পুড়িয়া যায়। বাবা, তুমি আমার পরম গুরু, আরাধ্য-দেবতা;—তোমাকে কোন কথা বলি, আমার এমন সাধ্য কি! কিন্তু বাবা, তোমার দুটি-পায়ে পড়ি, তুমি এ অসদ্‌বৃত্তি ত্যাগ কর, ধর্ম্মে মতি দাও, লক্ষ্মীস্বরূপা মার প্রতি প্রসন্ন হও! সতীর চক্ষে জল পড়িলে, আমাদের মঙ্গল নাই, বাবা!"

এই বলিতে বলিতে, ভাবময়ী কন্যা, পাপিষ্ঠ পিতার চরণ দুইখানি ধারণ করিল।

কন্যার কাতরতা দেখিয়া, ত্রিবক্রের কঠিন হৃদয় দ্রব হইয়া গেল বটে, কিন্তু অমনি সঙ্গে সঙ্গে, অন্তরে, প্রতিহিংসা-বহ্নি বিদ্যুদ্বেগে জ্বলিয়া উঠিল। এ বহ্নি, কিয়দংশ—কমলার উপর, অবশিষ্ট—হতভাগ্য-নরেন্দ্রের উপর দিয়া নির্ব্বাণ করিতে, পাপিষ্ঠ সঙ্কল্প করিল। পাপিষ্ঠ মনে মনে ভাবিল,—"ইহাদের জন্যই ত, প্রাণাধিকা কন্যা-আমার, সময়ে সময়ে অসুখী হয়!"

প্রকাশ্যে একটু হাসিয়া, উপেক্ষাভাবে কহিল,—"না মা দুলাল্! তোমাকে, কে এমন কথা বলে? আমি কি, ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কাজ করিতে পারি? আমি যাহা করি, সকলই তোমার ভালর জন্য জানিও, মা!"

অতঃপর, আর অধিক, কথা-কাটাকাটি করা ভাল নয় বুঝিয়া কহিল,—"যাও মা, তুমি একটু শোও গিয়ে; আমিও রাজবাড়ীতে যাই।"

প্রাণাধিকা কন্যার নিকট, ত্রিবক্রের প্রকৃতি এইরূপ। সুকুমারী দুলালীও পিতার সহিত, মধ্যে মধ্যে প্রায়ই এই ভাবের কথোপকথন করিয়া থাকে। ইঙ্গিতে-আভাষে—কখনও স্পষ্টভাষে, ধর্ম্মাধর্ম্মের আলোচনা করিয়া, বালিকা, পিতাকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করে। ত্রিবক্রও, সমগ্র জগতের উপর চটিয়া, কন্যাকে প্রাণান্তপণে ভাল বাসিতে লাগিল। তাহাকে এইরূপ উপদেশ দিয়া, ধর্ম্মশিক্ষায় তাহার হৃদয় মার্জ্জিত করিয়া, ত্রিবক্র হৃদয়ের তুল-দাঁড়ি সমান রাখিয়াছিল। কন্যার কাছে, সে, দেবতা; আর অন্যের নিকট একটি মূর্ত্তিমান-পিশাচ! ইহারই নাম দুর্ব্বোধ্য মানব-প্রকৃতি।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

দারুণ দুশ্চিন্তায় ও মানসিক কষ্টে, কোমল-প্রকৃতি কমলা, দিন দিন অবসন্ন হইতে লাগিলেন। স্বামী কন্যার ভাবনায়, তাঁহার সোণার অঙ্গ কালী হইতে লাগিল। ত্রিবক্রের কঠোর ব্যবহারে, তিনি যত মর্ম্মাহতা না হউন,—নরেন্দ্রের সহবাসে, স্বামীর পৈশাচিক কার্য্য-কলাপের কথা শুনিয়া শুনিয়া, সতী-রমণী, অন্তরে তুষানলে পুড়িতে লাগিলেন। প্রতি মুহূর্ত্তে, তাঁহার হৃদয়ের রক্ত শোষিত হইয়া আসিতে লাগিল। অভাগিনী, মনের কষ্ট মনে চাপিয়া, ক্রমে কঠিন রোগাক্রান্তা হইয়া পড়িল।

মাসাধিক কাল ধরিয়া, রাত্রে আহারাদির পর, কমলার একটু একটু জ্বর হইতে লাগিল। এই জ্বরই, তাঁহার কাল-স্বরূপ হইল। কমলা, এ জ্বরের কথা কাহাকেও বলিতেন না এবং তাহার প্রতিকার করা দূরে থাক,—এ বিষয়ে, একটু চিন্তাও করিতেন না,—উপেক্ষা করিয়া চাপিয়া রাখিয়াছিলেন। স্বামীর অমঙ্গল-আশঙ্কা ও কন্যার বিবাহ-চিন্তাই, তাঁহাকে, আর সকল কার্য্য হইতে দূরে রাখিয়াছিল।

ক্রমে পীড়ার লক্ষণ সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। লাবণ্যবতীর দেহ-লতাটি, ধনুকের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল। পৃষ্ঠের কঙ্কাল বাহির হইল। চাঁপাফুলের মত সোণার রং, পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করিল। বিশাল পদ্ম-আঁখি, কোটর-প্রবিষ্ট হইয়া, নিষ্প্রভ ও নিস্তেজ হইতে লাগিল। কণ্ঠনালী বাহির হইয়া পড়িল। এইরূপে, সৌন্দর্য্যময়ী কমলার, সকল সৌন্দর্য্য, একে একে অন্তর্হিত হইতে লাগিল।

ক্রমে, তাঁহার আহার উঠিল; সঙ্গে সঙ্গে দেহের বলও কমিয়া আসিল। এখন তিনি অতি দুর্ব্বল,—দু'পা চলিতে পারেন না; উঠিতে-বসিতে কষ্ট হয়; কথা কহিতে হাঁফ ছাড়েন। দেখিতে দেখিতে, তিনি শয্যাশায়িনী হইলেন।

চিকিৎসক আসিল; রীতিমত চিকিৎসাও চলিতে লাগিল। কিন্তু কোনরূপ সুফলের আশা রহিল না। রোগ, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। প্রতি পলে, রোগীর পরমায়ু ক্ষয় হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিল, কমলা, এ যাত্রা রক্ষা পাইবে না।

দুলালী, জগৎ-সংসার অন্ধকার দেখিল। তাহাকে ফাঁকি দিয়া, মা, জন্মের-মত যাইতেছে, ইহা বুঝিল। প্রতিক্ষণে বালিকার মর্ম্মস্থল ভেদ হইতে লাগিল। ত্রিবক্রের পাষাণ-হৃদয়ও, ক্ষণকালের জন্য দ্রব হইয়া গেল।

করুণা এ সময়ে অনুক্ষণ রোগীর শিয়রে বসিয়া সেবা-শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিনিও কমলার জীবনে হতাশ হইয়া, নীরবে, দুই ফোঁটা চক্ষের জল মুছিলেন।

স্নেহময়ী কমলা, একে একে সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। প্রাণাধিকা কন্যা দুলালীকে, অহর্নিশি রোরুদ্যমানা দেখিয়া, তাঁহার বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। স্নেহের দুলালের অদৃষ্টে কি ঘটিবে, তাহার পরিণাম কি হইবে, এই ভাবনায়, অভাগিনী মরিতে বসিয়াও মোহে অভিভূতা হইল!

দুলালী, মুমূর্ষু মাতার শিয়রে বসিয়া, অবিশ্রাম চোকের জলে, বুক ভাসাইতে লাগিল। সেই মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস, কাতর কণ্ঠের নীরব ভাষা, পলকহীন হতাশ দৃষ্টি,—প্রতিক্ষণে বালিকার মনোভাব প্রকাশ করিতে লাগিল। ত্রিবক্র, কন্যাকে, অনেক প্রকারে সান্ত্বনা করিবার চেষ্টা পাইল,—কিন্তু তাহাতে বালিকার মন প্রবোধ মানিল না। দুলালী, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, মুমূর্ষু মাতার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

একদিন কমলা অতি কষ্টে, ধীরে ধীরে কহিলেন,—"মা দুলাল্, কেঁদ না! ছিঃ, তুমি ত আমার অবুঝ মেয়ে নও মা! আমি ভাগ্যবতী,—তাই তোমাকে রাখিয়া, তাঁহাকে রাখিয়া যাইতে পারিলাম! পতির পায়ে মাথা রাখিয়া, যে রমণী মরিতে পায়, তার বাড়া জোর-কপাল কা'র আছে মা?"

দুলালী, রুদ্ধকণ্ঠে কহিল,—"মা, আমাকে কাহার কাছে রাখিয়া চলিলে? আমার দশা কি হইবে মা?"

কমলার চক্ষে জল আসিল। কিন্তু সে অশ্রু, আর গণ্ডস্থলে বহিতে পারিল না,—যেখানকার বস্তু, সেইখানেই মিশিয়া রহিল। দুলালী ধীরে ধীরে, অঞ্চল দ্বারা, মায়ের সেই কোটরস্থ অশ্রু মুছিয়া দিল। কমলা আবার কহিলেন,—"মা, তাহা কি না ভাবিয়াছি! মরিলে ত,

আমি সকল জ্বালা জুড়াইব; স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইব;—কিন্তু মা রে, তোর ভাবনা ভাবিলে, এক একবার আমার বাঁচিতেও ইচ্ছা হয়। মনে বড় সাধ ছিল, তোকে স্বামি-সোহাগিনী দেখিয়া, হাসিতে হাসিতে মরিব। কিন্তু 'হায়, বিধাতা আমাকে, সে সুখে বঞ্চিত করিলেন!"

অভাগিনীর চক্ষে আবার জলধারা দেখা দিল। দুলালী, অঞ্চল দ্বারা তাহা মুছিয়া দিয়া কহিল,—"থাক্ মা, ও কথা আর তুলিয়া কাজ নাই। তুমি একটু ঘুম'বার চেষ্টা কর।"

কমলা কহিলেন,—"মা, আর দু'দিন পরে ত আমি চিরদিনের মত ঘুমাইব। তা'র আগে, তোকে দুটো কথা বলিয়া যাই মা! দুলাল্! যখন বিবাহিতা হইবে, স্বামীকে দেবতার মত ভক্তি করিও। স্বামি রূপবান হোন, আর কুৎসিত হোন; গুণবান্ হোন, আর নির্গুণ হোন, তাঁহাকে ইষ্ট-দেবতা বলিয়া জানিও! মেয়ে-মানুষের স্বামীই দেবতা, স্বামীই ঈশ্বর! স্বামীর বাড়া পূজনীয়, তাহার আর কেহ নাই মা! আমি চলিলাম বটে, কিন্তু তুমি অধৈর্য্য হইও না। তিনি রহিলেন,—তাঁর কাছে ত মা, তুমি আমাপেক্ষাও অধিক স্নেহ পাও! তিনি তোমাকে প্রাণাপেক্ষাও ভাল বাসেন। আহা, তাঁর সুমতি হইলে, এইখানেই আমার স্বর্গবাস হইত। নারায়ণ কতদিনে, তাঁর প্রতি প্রসন্ন হইবেন!"

এই বলিতে বলিতে কমলার কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইয়া আসিল। সাধ্বী রমণী, মনে মনে স্বামীর মঙ্গল প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। অতঃপর, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন,—"মা দুলাল্, যখন একান্ত অধৈর্য্য হইবে, অগতির গতি হরিকে স্মরণ করিও,—তিনিই কূল দিবেন। সম্পদে বিপদে, জীবনে মরণে,—দয়াময় হরির চরণ কখন ভুলিও না, মা!"

অতঃপর ভক্তিভরে কহিলেন,—"মা দুলাল্, তুমি একটু ভাগবত পড় দেখি, আমি শুনি।"

বালিকাও সময় বুঝিয়া, ভাগবত হইতে, ভক্তিমার্গের চরম উপদেশ—বৈরাগ্য ও শান্তি-মাহাত্ম্য নির্ব্বাচন পূর্ব্বক, পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। কল্পতরু ভগবান্ বাসুদেবের লীলা-বৈচিত্র্য শুনিতে শুনিতে

ভক্তিমতী কমলা, ইহসংসার ভুলিয়া গেলেন। ভাবময়ী বালিকার পঠন-ভঙ্গিমায়, ভাগবতের প্রতি পংক্তি যেন, সুধাবর্ষণ করিতে লাগিল। সে সুধাপানে, মা ও মেয়ে উভয়েই, ক্ষণকালের জন্য তন্ময়ী হইয়া রহিল। ত্রিবক্র, দূর হইতে এ দৃশ্য দেখিয়া, নীরবে দুই ফোঁটা চক্ষের জল মুছিল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

আরও দুই চারিদিন কাটিয়া গেল। আজ কমলার জীবনের শেষ দিন। সুবর্ণ-দীপ হাসিয়া উঠিল। অন্যান্য দিন অপেক্ষা, আজ কমলা একটু সুস্থ আছেন; সকলের সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতে পারিতে-ছেন; তাঁহার মনটাও আজ একটু প্রফুল্ল আছে। কিন্তু সকলেই বুঝিল,— আজ লক্ষ্মীস্বরূপা কমলার জীবন-দীপ, চিরদিনের মত নির্ব্বাণ হইবে! সৌন্দর্য্যময়ী সোণার প্রতিমা, অনন্তকালের জন্য, কালের জলে ডুবিয়া যাইবে!

ত্রিবক্র, দুলালী, ও করুণা—সকলেই আজ রোগীর শিয়রে সমুপস্থিত। কমলা, একে একে সকলের নিকট হইতে, জন্মের-মত বিদায় লইলেন! একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া, করুণাকে কহিলেন,—"দিদি, তোমার কাছে অনেক বিষয়ে ঋণী রহিলাম; ইহজন্মে, তাহা আর পরিশোধ করিতে পারিলাম না। আশীর্ব্বাদ কর, পরজন্মে, তোমাকে যেন, মার-পেটের বোন্ পাই।"

করুণাও অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কহিলেন,—"কমল, তোমার মত গুণবতী ভগিনী লাভ করা, বড়-কম সৌভাগ্যের কথা নয়।" মনে মনে কহিলেন,— "ভগিনি, ভগবানের নিকট প্রার্থনা কর, যেন পরজন্মে, তোমার মত আমিও এইরূপে স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া যাইতে পারি!"

অতঃপর, কমলা কি-একটু ইঙ্গিত করিলেন; নারীর প্রাণ নারীই বুঝিল,—করুণ-প্রাণা করুণা, দুলালীকে লইয়া, ক্ষণকালের জন্য তথা হইতে কক্ষান্তরে প্রবেশ করিলেন। এইবার সাধ্বী, সময় বুঝিয়া ডাকিলেন,—"স্বামিন্!—"

ত্রিবক্র, একটু অগ্রসর হইয়া, বিষণ্ণভাবে, কমলার পার্শ্বে উপবেশন করিল। নির্ব্বাণোন্মুখ সুবর্ণ-দীপ আবার হাসিয়া উঠিল। যেন আব-ছায়া দিবালোকে, ছিন্ন-মেঘের কোলে, ক্ষীণা সৌদামিনীর বিকাশ! তাহা আভাহীন, প্রভাহীন, শোভাহীন, প্রাণহীন! কিন্তু ত্রিবক্রের নিকট, সতী-নারীর সেই ম্লান-হাসিই আজ অতুলনীয়। হতভাগ্য, দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা বুঝে নাই!

কমলা কিছু ক্ষুণ্ণস্বরে কহিলেন,—"ওকি স্বামিন্! তুমি বিষণ্ণভাবে ওখানে, অমন করিয়া বসিলে কেন? আজ যদি তোমার হাসি-মুখ না দেখিয়া মরিলাম, তবে আমার মরণেও সুখ নাই! স্বামিন্, আজীবন, একদিনের জন্যও, তোমার ভালবাসা পাই নাই; পোড়া কপালগুণে, চিরদিন তুমি, দাসীকে, বিষ-নয়নে দেখিয়াছ; আমি দিনান্তে তোমার শ্রীচরণ দেখিয়া সে দুঃখ ভুলিয়া আসিয়াছি! কিন্ত, আজ যদি তুমি দাসীর প্রতি বাম হও; আজ যদি না দাসীকে হাসিমুখে বিদায় দাও,—তবে মরিলেও আমার এ ক্ষোভ মিটিবে না!"

বলিতে বলিতে, অভাগিনীর চক্ষে জল আসিল। ত্রিবক্রও, সতী-নারীর পতিভক্তি দেখিয়া, ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইল। সাধ্বী সহধর্ম্মিণীর প্রতি, তাহার অনেক দিনের অনেক নিষ্ঠুরতার কথা মনে পড়িল। কমলার সেই অমানুষিক সহিষ্ণুতা ও অকৃত্রিম পতিভক্তি স্মরণ করিয়া, পাপিষ্ঠ, ক্ষণকালের জন্য, অনুতাপানলে দগ্ধ হইতে লাগিল। আবার সেই সতী-প্রতিমা, আজ জন্মের-মত, তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছে,—এক কালে সকল স্মৃতি অন্তরে আবির্ভাব হইবামাত্র, শত-বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায়, ত্রিবক্র, উন্মত্তভাবে কহিয়া উঠিল,—"গৃহলক্ষ্মী আমার!—তুমি কোথা যাইবে? হায়, আমি অধম, পাপাচারী ও দুর্ম্মতিপরায়ণ,—তাই তোমাকে চিনিতে পারি নাই! চিরদিন তোমাকে নির্য্যাতন করিয়া আসিয়াছি। কমল, তাই বলিয়া কি তুমি, এ হতভাগ্য-স্বামীকে ত্যাগ করিয়া যাইবে?"

সতী-প্রতিমা কমলা কহিলেন,—"ছিঃ! এমন কথা মুখে আনিও না। ইহাতে আমার অকল্যাণ হয়। স্বামিন্! তুমি আমার মাথার মণি; হৃদয়ের আরাধ্য-দেবতা; দাসীকে কি এমন কথা বলিতে আছে?

তোমাকে রাখিয়া, প্রাণাধিকা দুলালকে রাখিয়া যে, আমি যাইতে পারিলাম, ইহার বাড়া আর আমার সুখ কি! নাথ! সাহস করিয়া, কখন তোমাকে অধিক কথা কহিতে পারি নাই; প্রাণ ভরিয়া, সেবা-ভক্তি করিতেও দাসীকে ভরসা দাও নাই। তাই আজ, এই অন্তিমকালে, আমার মনের সকল খেদ মিটাইয়া চলিলাম। প্রাণেশ্বর! আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্ম জন্ম, তোমাকেই স্বামী পাই!"

বলিয়া, সাধ্বী-রমণী, অনুরাগভরে স্বামীর হাতখানি আপন বক্ষে ধারণ করিলেন। এই সময়ে, কন্যা দুলালীও, সেইস্থানে উপস্থিত হইল। কমলা, ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন,—"দুলাল!——"

দুলালী, কাঁদিতে কাঁদিতে, মাতার শিয়রে উপবেশন করিল। কমলা কহিলেন,—"মা-আমার, কাঁদিও না! আমা অপেক্ষাও তোমার পরম-গুরু রহিলেন। আশীর্ব্বাদ করি, এইবার তুমি মনোমত পতি লাভ করিয়া, মনের সুখে কাল কাটাইবে। দুলাল,—মা আমার! আবার বলি, মনে যেন সকল সময়েই জাগরূক থাকে, স্ত্রীলোকের, পতির-বাড়া মহাগুরু আর কেহ নাই!"

এই বলিয়া কন্যার কোমল হাতখানি স্বামীর হাতে দিয়া কহিলেন,—"স্বামিন্, আমার দুলালকে দেখিও! আর যত শীঘ্র পার, তোমার মনোমত পাত্রেই, কন্যাকে সমর্পণ করিও। এ সম্বন্ধে, আমি আর তোমায় কিছু বলিয়া বিরক্ত করিতে আসিব না। আমি জানি, দুলালকে তুমি প্রাণাপেক্ষাও ভালবাস। যাহাতে সেই ভালবাসা বজায় থাকে, করিও। স্বামিন্! জ্ঞানকৃত কোন অপরাধ কখন করি নাই; যদি না বুঝিয়া অপরাধিনী হইয়া থাকি, পদাশ্রিতা দাসীজ্ঞানে, ক্ষমা করিও।"

এই বলিয়া, পতিব্রতা, পরম ভক্তি-সহকারে, স্বামীর পদ-ধূলি গ্রহণ করিলেন। পরে তাহা জিহ্বায় স্পর্শ করিয়া, মস্তকে স্থাপন করিলেন। ত্রিবক্র, চিত্রার্পিতের ন্যায়, সজল-নয়নে, স্তম্ভিত ভাবে, সতী-প্রতিমার মুখপানে চাহিয়া রহিল।

কমলার প্রাণবায়ু ধীরি ধীরি ক্ষয় হইতে লাগিল। তিনি ক্রমেই অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। দেখিতে দেখিতে, আরও তিন চারি দণ্ড কাল কাটিয়া গেল।

ফাল্গুনমাস,—গোধূলি কাল সমুপস্থিত। বসন্ত সমাগমে, প্রকৃতি-রাজ্য, নব বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়াছে। আকাশ স্বচ্ছ ও সুনীল। মলয়-বায়ু মৃদু-মন্দ বহিতেছে। সেই বায়ু সেবনে সকলেই জাগ্রত হইয়াছে। বৃক্ষ লতা পাতা সকলই সজীব ও উৎফুল্ল। ফলে-ফুলে চারি-দিক সুশোভিত। মধুকর দল গুন্ গুন্ রবে, এক পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে উড়িয়া যাইতেছে। সুমধুর কুহুস্বরে, দিঙ্মণ্ডল বিকম্পিত হইয়া উঠি-তেছে। গ্রাম্য রাখালদল, গোচারণের মাঠ হইতে গাভী লইয়া, মনের হরষে গীত গাহিতে গাহিতে যাইতেছে। সান্ধ্য-সমীরণ সেবনার্থ, বালক-যুবক দল ঘাটে, মাঠে, পথে, উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছে। পশ্চিমা-কাশের অতি নিম্নদেশে, সূর্য্যদেব, একখানি সোণার থালার-মত, ক্রমেই অদৃশ্য হইতেছেন। তাঁহার সেই শেষ কিরণমালা, অতি অল্পমাত্রায় বৃক্ষে, প্রাসাদে, তড়াগে, ক্ষেত্রে পতিত হইয়া, অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার করিতেছে। অর্দ্ধ আলোক ও অর্দ্ধ আঁধারের সমাবেশে, প্রকৃতি-দেবী, যেন হর-গৌরী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন।

এই প্রীতিপ্রদ সময়ে, কমলা, একবার চক্ষু উন্মীলন করিলেন। অতি কষ্টে ধীরে ধীরে ডাকিলেন,—"দুলাল্ !——"

স্নেহময়ী কন্যাও, আকুলপ্রাণে, কাতরকণ্ঠে কহিল,—"কি মা?—কেন মা?"

কমলা, সেই স্বরে, আবার বলিলেন,—"তিনি কোথায়?"

ত্রিবক্রের কণ্ঠস্বর, এখন অতি গম্ভীর। সেই গম্ভীরস্বরে, গদ্গদকণ্ঠে কহিল,—"গৃহলক্ষ্মী আমার,—এই যে আমি!"

বলিয়া, প্রেম-প্রতিমা সহধর্ম্মিণীর হাতখানি ধরিল। সুবর্ণ-দীপ আর একবার হাসিয়া উঠিল। কমলা কি-ইঙ্গিত করিলেন; ত্রিবক্র তাহা বুঝিল। ধীরে ধীরে কমলার মাথার নিকট আসিয়া দাঁড়াইল। সতী-প্রতিমা, ঈষৎ স্মিতমুখে, ধীরে ধীরে, স্বামীর পাদপদ্ম মস্তকে ধারণ করি-লেন। ত্রিবক্র, উদ্‌ভ্রান্তভাবে ডাকিল,—"কমল!"

উত্তর পাইল না। তাহার স্বর আরও গম্ভীর হইল। পুনরায় ডাকিল,—"কমল!—গৃহলক্ষ্মী আমার!"

এবারও উত্তর নাই। ত্রিবক্র, অতি ধীরে, সভয়ে, সন্তর্পণে সহধর্ম্মি-

নীর নাসিকা স্পর্শ করিল! এবার আরও গম্ভীরস্বরে, কম্পিতকণ্ঠে ডাকিল, —"কমল, প্রাণাধিকে, সতি!——"

হরি হরি হরি!!!——

প্রেম-প্রতিমা, পতিব্রতা, মূর্ত্তিমতী কমলা, স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া, নীরবে নশ্বর-দেহ ত্যাগ করিয়া, অনন্তধামে চলিয়া গিয়াছেন!!

অমনি, পাষাণভেদী করুণকণ্ঠে, "মাগো, কোথায় গেলে গো!" বলিয়া বালিকা, ছিন্ন-লতার ন্যায়, শবদেহে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল

সব ফুরাইল।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

দেখিতে দেখিতে একমাস কাল অতিবাহিত হইল; ত্রিবক্রের অশৌচকাল কাটিয়া গেল। পত্নী-বিয়োগে, কয়দিনের জন্য, তাহার মনোভাব, একটু কোমল হইয়াছিল; অন্তরে একটু ঘাত-প্রতিঘাত দেখা দিয়াছিল। কিন্তু, স্বভাব ও সংস্কারবশে এবং সংসর্গ-দোষে, তাহা অধিককাল স্থায়ী হইল না। দেখিতে দেখিতে, আবার যে ত্রিবক্র, সেই ত্রিবক্র হইয়া উঠিল। বরং শোকের মোহে, তাহার স্বাভাবিক বক্রতা, দ্বিগুণ-বেগ ধারণ করিল। পাপিষ্ঠ মনে মনে ভাবিল,—"যাই হোক, এক সতী-সাধ্বী সহধর্ম্মিণী ছিল,—সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, আমার মর্ম্মকথা—মর্ম্মব্যথা বুঝিতে পারিত; আমার জন্য 'আহা' বলিয়া দুই ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিত,—সেও চলিয়া গেল! কি পাপে আমি এমন পতিব্রতা সহধর্ম্মিণীকে হারাইলাম! কোন্ পাপে—কার অভিশাপে আমার এ সুখটুকুও লোপ পাইল! কেন, সংসারে এত লোকের ত পত্নী রহিয়াছে,—নরেন্দ্রেরও ত পত্নী রহিয়াছে,—কিন্তু আমার মত ত কাহারও কপাল পুড়িল না! একি অবিচার! এ, কিরূপ শত্রুতা! যাই হোক, আমিও এখন হইতে, পাষাণে বুক বাঁধিলাম। যে কয়দিন পৃথিবীতে থাকিব, প্রাণ ভরিয়া, লোকের সহিত শত্রুতা করিব! নরেন্দ্রকে, আরও অধঃপাতে লইয়া যাইব, বিধিমতে উচ্ছিন্ন দিব,— অবশেষে তাহাকে প্রাণে মারিব; তবে আমার নাম ত্রিবক্র সরকার।

পাপপুণ্য আবার কি? কিসের ধর্ম্মাধর্ম্ম? তবে নরেন্দ্রকে হাতে পাইয়া, আমি ছাড়ি কেন?"

পাপিষ্ঠের মনোভাব এখন এইরূপ। কন্যা দুলালী, মাতৃশোকে একান্ত অভিভূতা হইয়া পড়িল। করুণা-পিসী এখন অনুক্ষণ তাহার খোঁজ-খবর লইতে লাগিলেন এবং নানারকমে তাহাকে সান্ত্বনা করিতে চেষ্টা পাইলেন। ত্রিবক্রও, বিধিমতে কন্যাকে প্রফুল্লিত করিতে যত্নবান্ হইল। নানাপ্রকার সরল উপদেশে, সংসারের অনিত্যতা বুঝাইতে চেষ্টা পাইল। অধিকন্তু, তাহাকে স্থানান্তরিত করিতেও, মনস্থ করিল।

কেবলই যে, দুলালী, মাতৃশোক ভুলিতে পারিবে বলিয়া, ত্রিবক্র তাহাকে স্থানান্তরিতা করিতে মনঃস্থ করিল, তাহা নহে;—ইহার মূলে, আরও একটি গূঢ় কারণ আছে। ত্রিবক্র, সদাই সন্দিগ্ধমনা,—জগতের কাহারও প্রতি, তাহার তিলার্দ্ধ বিশ্বাস নাই। একদিন সে মনে মনে ভাবিল,—"দুলাল্ আমার এখন বয়ঃস্থা হইয়াছে; তাহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য, এখন আরও প্রস্ফুটিত হইয়াছে,—লোকের পাপ-চক্ষু, ইহার উপর পড়িতে পারে। হয়ত, কোন দিন, কোন্ দুরাচারের করাল গ্রাসে পড়িয়া, মার আমার অমূল্য-নিধি নষ্ট হইবে! বিশেষ, নানা কারণে, অনেক দুষ্‌মনের, আমার উপর রাগ আছে। সুবিধা পাইলে, পাপিষ্ঠেরা কেহ-না-কেহ, আমার উপর বাদ সাধিতে পারে। তাহা হইলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে! অতএব অবিলম্বে দুলাল্‌কে স্থানান্তরিতা করা আবশ্যক। নূতন স্থানে যাইলে মা-আমার, তার গর্ভধারিণীর শোকও, শীঘ্র ভুলিতে পারিবে।"

এই ভাবিয়া ত্রিবক্র, একদিন নরেন্দ্রের নিকট প্রস্তাব করিল যে, নরেন্দ্রের অমুক স্থানের উদ্যান-বাটীটি, তাহাকে, কিছুদিনের জন্য, ছাড়িয়া দিতে হইবে। সে, কন্যাকে লইয়া, তথায় কিছুদিনের জন্য, অবস্থান করিবে। যেহেতু, মাতৃশোকে, তাহার প্রাণাধিকা কন্যা, অত্যন্ত বিহ্বলা হইয়া পড়িয়াছে। স্থান-পরিবর্ত্তনে, সে শোক, অনেকটা উপশমিত হইতে পারিবে।

নরেন্দ্র, সানন্দে প্রিয়-বন্ধু ত্রিবক্রের প্রস্তাব-অনুমোদন করিল। কহিল,—"আমার দুই তিনটা বাগান-বাড়ী আছে,—তোমার যেটা ইচ্ছা,

—কিছুদিনের জন্ত কেন,—চিরকাল ব্যবহার করিতে পার। তুমি, আমার জিনিস ব্যবহার করিবে, ইহা ত সুখের কথা হে!”

অতঃপর, সোহাগভরে কহিল,—“দেখ ভাই, স্ত্রী-বিয়োগের পর হইতে, তুমি কেমন মুস্‌ড়িয়া যাইতেছ; আর তেমন করিয়া, আমোদ-আহ্লাদ কর না। সময়ে-সময়ে একটু বিষণ্ণও দেখি। ও কি ভাই! খাও-দাও মজা কর,—কিসের শোক!”

ত্রিবক্রও উৎসাহিত হইয়া কহিল,—“ভাল, তাহাই হইবে। আজ হইতে আবার মজলিস জমাইয়া দিব।”

“আমিও ত তাই চাই” বলিয়া নরেন্দ্র, আহ্লাদে আটখানা হইল।

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

যথাসময়ে ত্রিবক্র, কন্যাকে এ কথা জ্ঞাত করিল। কহিল,—“মা দুলাল্, দেখিতেছি, তুমি, তোমার গর্ভধারিণীর শোকে, ক্রমশই অভিভূতা হইয়া পড়িতেছ। দীর্ঘকাল, এরূপ শোকাচ্ছন্ন থাকিলে, উৎকট রোগ জন্মিবার সম্ভাবনা। তাই মা, আমি সঙ্কল্প করিয়াছি যে, কিছুদিনের জন্য, তোমাকে স্থানান্তরিতা করিব। স্থান পরিবর্ত্তনে, মন অনেকটা প্রফুল্ল হয়।”

কথাটা, দুলালীর মনে, ভাল লাগিল না। বালিকা বিনীতভাবে, নতমুখে পিতাকে কহিল,—“বাবা, মার শোক যাহা লাগিবার লাগিয়াছে। সে কষ্ট, এখন আর নূতন বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু স্থান পরিবর্ত্তনে, বোধ হয় আমার অধিক কষ্ট হইবে।”

ত্রিবক্র কহিল,—“সে কি মা! আমি তোমার কাছে থাকিব; কষ্ট কেন হইবে মা!”

“বাবা, এখানে পিসী মা আছেন, পাড়া-প্রতিবাসী সকলে আছেন,—সেখানে ত, ইহাঁদিগকে দেখিতে পাইব না। আমার মন খারাপ হইলে, পিসী-মার মত ত কেহ, আমাকে তেমন সান্ত্বনা করিতে পারিবে না। আহা, বাবা! পিসী-মা আমাকে, ঠিক যেন আপনার ভাই-ঝীর মত দেখেন।”

ত্রিবক্র, একটু ইতস্তত করিয়া কহিল,—"তা—নয় তোমার পিসী-মা, সময়ে সময়ে তোমাকে দেখিয়া আসিবেন। সেত আর বেশী দূর নয়। আমি তাঁর গাড়ী-পাল্কীর ভাড়া দিব।"

দুলালী, একটু ক্ষুণ্ণভাবে কহিল,—"কিন্তু বাবা, বাড়ী হইতে যাইতে, আমার মন সরিতেছে না।"

ত্রিবক্র উপেক্ষাভাবে কহিল,—"ও কিছু নয় মা! মনে যা' ভাবিবে, তাই সত্য বোধ হইবে। আর, আমরা ত একবারে চিরদিনের মত যাইতেছি না। সেখানে দুই চারি মাস থাকিয়া, আবার বাড়ী ফিরিব।

"সে, কোথায় বাবা?"

"বেশী দূর নয় মা। সীতারামপুরের নাম শুনেছ? সেইখানে। এখান হইতে বড় জোর একক্রোশ পথ হইবে। সেখানে রাজা বাহাদুরের একখানি বাঙ্গালা আছে, সেই বাগান-বাড়ীতে আমরা থাকিব। সেস্থান কেমন নির্জ্জন; চারিদিকে প্রকৃতির শোভায়, মন মুগ্ধ হইতে থাকে। তুমি সেখানে গেলে, হয়ত আর এ বাড়ীতে, আসিতেই চাহিবে না। এমন মনোহর স্থান, মা!"

দুলালী, কিছুক্ষণ নিবিষ্টমনে, কি ভাবিয়া, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, কহিল,—"আচ্ছা, যা—ব।"

দিন স্থির হইল। আজ ত্রিবক্র, কন্যাকে লইয়া, স্থান পরিবর্ত্তন করিবে। দুলালী, সজল-নয়নে, আত্মীয়-প্রতিবাসী জনের নিকট হইতে, একে একে বিদায় গ্রহণ করিল। করুণা, অঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া কহিলেন, —"মা দুলু, যেখানে থাক, সুখে থেক, ভাল থেক;—কায়-মনঃ-প্রাণে, এই আশীর্ব্বাদ করি। আরও আশীর্ব্বাদ করি, শীঘ্রই যেন তুমি, মনোমত পতি লাভ করিয়া, মনের সুখে গৃহধর্ম্ম পালন কর।"

অতঃপর দুলালীর চিবুকখানি ধরিয়া কহিলেন,—"মা দুলু, এ দুঃখিনী পিসীকে, মনে রাখিবে ত?"

দুলালীও একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"পিসি মা, তোমায় দেখিয়া, মার শোক ভুলিয়াছিলাম। তোমায় মনে থাকবে না? আর, আমরা দুই তিনমাস পরেই এখানে ফিরিব। পিসী মা! তোমাকে লইয়া যাইতে লোক পাঠাইলে, যাইবে ত?"

করুণা কহিলেন,—"তোমায় দেখিতে যাইব না মা! অবশ্যই যাইব!"

অতঃপর, ত্রিবক্র, তথায় উপস্থিত হইল। কন্যাকে কহিল,—"এস মা, আর বিলম্ব ক'র না,—গাড়ী প্রস্তুত।"

ত্রিবক্র আর কাহাকে কিছু না বলিয়া, তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিল। প্রস্থান করিতে করিতে, মনে মনে বিরক্ত হইয়া কহিল,—"এরাই পাঁচজনে দেখিতেছি, আমার মেয়েটাকে, কি 'গুণ' করিয়াছে! নহিলে, মার-আমার, এদের প্রতি এত মমতা কেন? যাই হোক, একবার মেয়েটাকে সেখানে লইয়া গিয়া তুলিতে পারিলে হয়,—কোন বেটা-বেটীকে, সে বাড়ীতে ঢুকিতে দিব না!"

ত্রিবক্র, তখনই আবার একজন পরিচারিকাকে, তথায় পাঠাইয়া দিল। তাহাকে দেখিয়া, করুণা-পিসী কহিলেন,—"মা দুল্! চল,—তোমাকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া আসি।"

দুলালী, ভূমিষ্ঠ হইয়া, পিসীকে প্রণাম করিল। করুণাও তাহার মস্তকাঘ্রাণ করিলেন। তাঁহার চক্ষু বাষ্পপূর্ণ হইয়া আসিল। দুলালীও, করুণাপিসীকে শেষ নিরীক্ষণ করিল। আবার চারি চক্ষের মিলন হইল। সেই নীরব দর্শনের, নীরব ভাষা, কেবলই অনুভবনীয়,—বুঝাইবার নহে।

বাটীর বাহিরে পা দিতে- না-দিতে, হঠাৎ দুলালীর দক্ষিণ অঙ্গ স্পন্দিত হইল ও বুক কাঁপিয়া উঠিল। বালিকা চমকিয়া দাঁড়াইল। করুণা কহিলেন,—"কি মা দুল্! ও রকম ক'রে দাঁড়ালে যে?"

দুলালী একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, কি ভাবিয়া কহিল,—"না!——"

দুলালী, শকটে আরোহণ করিল। গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিলে, যতদূর দৃষ্টি যায়, দুলালী, অনিমিখ-নয়নে, করুণা-পিসীকে দেখিতে লাগিল। যখন দৃষ্টি-পথ অতিক্রান্ত হইল, দুলালী, একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, অঞ্চলে চক্ষু মুছিল। ত্রিবক্র কন্যাকে প্রফুল্ল করিবার জন্য, অদূরস্থ শ্যামলক্ষেত্র দেখাইয়া, স্নেহভরে কহিল,—"দেখ দেখি মা, প্রকৃতির কি অপূর্ব্ব শোভা!"

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

বাসন্তীপুর হইতে সীতারামপুর, কিঞ্চিদধিক দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এ স্থানটি অতি রমণীয়। চারিদিকে প্রকৃতির শোভা বিরাজিত। বহুদূরব্যাপী শ্যামলক্ষেত্র, অনন্ত নীলাকাশ স্পর্শ করিতেছে। দূর হইতে বোধ হয়, যেন একখানি সুবিস্তৃত সবুজ গালিচা, ধরণীপৃষ্ঠে পাতিত রহিয়াছে। এক স্থান দিয়া একটি ক্ষুদ্র খাল মৃদু-মন্দ গতিতে বহিতেছে। সেই খালের তীরদেশ হইতেই, বহুকালের একটি পুরাতন মন্দির, উচ্চশিখরে দণ্ডায়মান আছে। মন্দির-মধ্যে চামুণ্ডা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বাসন্তীপুরের জনৈক পূর্ব্বতন জমিদারকর্ত্তৃক এই দেবী-মূর্ত্তি সংস্থাপিত। সাধারণ-ব্যয়ে এখন ইঁহার দৈনিক পূজাদি সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই কালিকা-দেবীর মাহাত্ম্য অতি প্রসিদ্ধ। প্রতি আমাবস্যার রাত্রে, স্থানীয় অধিবাসীগণের মানসিক পূজাদি এখানে প্রেরিত হয়। কেহ কেহ বা খুব ধুম-ধাম করিয়া, সস্ত্রীক পূজা দিতে আসিয়া থাকে। মন্দিরের পার্শ্বেই লতাগুল্মবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র বন। চারিদিক বৃক্ষ-লতা ও বাগান-বাগিচায় পূর্ণ। বিহঙ্গমকুল অবিরাম সুমধুরস্বরে গান করিতেছে। একস্থানে একটি প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা অবস্থিত। তাহার অধিকাংশ স্থান জলজ-উদ্ভিদে পূর্ণ। বক ডাহুক প্রভৃতি জলচর-পক্ষী তাহার তীরে বিচরণ করিতেছে। চতুর মাছরাঙ্গা, নিকটস্থ বৃক্ষে বসিয়া, স্থির লক্ষ্যে শিকারে নিযুক্ত আছে। স্থানে স্থানে দুই একখানি ক্ষুদ্র কুটীর দৃষ্ট হয়। দুই-চারি-ঘর মাত্র কৃষিজীবি প্রজা, তথায় বাস করিয়া থাকে। সীতারামপুরের কিঞ্চিৎ দক্ষিণে, নিবিড় জঙ্গল। এ স্থান হইতে তাহার শোভা, অতীব মনোহর।

প্রকৃতির এই শান্তপূর্ণ পবিত্র স্থানে, নরেন্দ্রের উদ্যান-বাটী বিরাজিত। এই উদ্যান-বাটীটি অতি পরিপাটিরূপে সজ্জিত। ইহার দৈর্ঘ প্রস্থে প্রায় আট বিঘা ভূমি, সুদৃশ্য রেলিং দ্বারা বেষ্টিত। তাহার এক পার্শ্বে একটি বাঁধা ঘাট বিশিষ্ট পুষ্করিণী। পুষ্করিণীর জল অতি স্বচ্ছ। প্রাসাদের আর এক পার্শ্বে পুষ্পোদ্যান। তথায় বেলা, মল্লিকা, যুই, গোলাপ প্রভৃতি নানানজাতায় পুষ্প-বৃক্ষ, শ্রেণীবদ্ধ পূর্ব্বক রোপিত।

তাহাতে স্তূপাকারে ফুল-দল প্রস্ফুটিত হইয়া, অপূর্ব্ব শোভা ও সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতেছে। তাহার গন্ধে, চারিদিক আমোদিত হইতেছে। মধুকরদল গুন্ গুন্ স্বরে, ইতস্তত উড়িয়া বেড়াইতেছে। স্থানে স্থানে, তরু-লতা-পাতা-বেষ্টিত এক একটি বিশ্রাম কুঞ্জ। উদ্যানের চারি পার্শ্বে নারিকেল ও সুপারি বৃক্ষ শ্রেণীবদ্ধ। তাহার এক পার্শ্বে, উদ্যান-রক্ষক ও পরিচারকগণের ক্ষুদ্র কুটীর। সম্মুখে লৌহ-কবাট-বিশিষ্ট ফটক-দ্বার। এইরূপ সর্ব্বপ্রকারে, উদ্যান-বাটীটি অতি মনোহর ও প্রীতিপ্রদ।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

ত্রিবক্র, প্রাণাধিকা কন্যাকে লইয়া এখন এইখানে অবস্থান করিতেছে। এখানে লোকের কোলাহল নাই, কোন প্রকার হিংসাদ্বেষও নাই। সর্ব্বক্ষণই শান্তি, পবিত্রতা ও মাধুর্য্য বিরাজ করিতেছে। সুতরাং ত্রিবক্র, এখানে কন্যাকে আনিয়া অনেকটা নিরুদ্বেগ হইল। দেখিতে দেখিতে এক মাস কাল অতিবাহিত হইয়া গেল।

এই কবিতা-রাজ্যে আসিয়া, ভাবময়ী দুলালী, আরও ভাবমগ্না হইয়া পড়িল। প্রথম প্রথম দুই চারি দিন একটু কষ্ট হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখন আর তাহা নাই। বালিকা সর্ব্বদাই নির্জ্জনে থাকিতে অভ্যস্থা হইয়া, পূর্ব্বাপেক্ষাও অধিক চিন্তাশীলা, সরলা, ঐশীভক্তি-পরায়ণা, এবং ভাবময়ী হইয়া উঠিল। মানুষের প্রাণে প্রাণ-সংমিশ্রণ তাহার ভাগ্যে ঘটিল না ভাবিয়া, বালিকা এখন, ঐকান্তিকী ভক্তি-সহকারে, সেই প্রাণ বিশ্বপতির চরণে অর্পণ করিল। ভাবিল,—"বিধাতা আমার অদৃষ্টে পতি লিখেন নাই ;—আমাকে চিরকুমারী করিয়া রাখাই তাঁহার অভিপ্রায়। তবে কেন, অনর্থক পার্থিব পতির বিষয় চিন্তা করি! বুঝিয়াছি, আমার পতি-ভাগ্য একবারেই নাই। আমি বিবাহিতা হই, বুঝি, ভগবানের ইচ্ছা নয়। যাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়, তাহার চিন্তা করাও অধর্ম্ম। মন! যদি তুমি যথার্থ ভালবাসিতে শিখিয়া থাক ; মাতৃ-স্তনপানের সহিত ভালবাসার আস্বাদ পাইয়া থাক,—তবে সেই ভালবাসা, ঈশ্বরের চরণে সমর্পণ করিতে চেষ্টা কর ;—তোমার সকল

জঞ্জাল মিটিবে।” বালিকার মনোভাব এখন এইরূপ। বিকারের লেশ-মাত্রও, তাহাতে আর নাই। দুলালী কোন কোন দিন, পরিচারিকাকে সঙ্গে লইয়া, সন্নিকটস্থ উক্ত চামুণ্ডা মন্দিরে যাইত এবং ভক্তিভরে দেবী-পদে প্রণাম করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে বাটী ফিরিয়া আসিত।

অধিকন্তু দুলালী, পিতাকে বলিয়া, সেই পবিত্র উদ্যান-বাটীতে একটি তুলসীমঞ্চ সংস্থাপিত করিল। বালিকা, মার মুখে শুনিয়াছিল,—‘তুলসী-তলে, নারায়ণ অধিষ্ঠিত হন; সেই জন্য লোকে, সেই পবিত্র স্থানে ‘হরি-লুট’ দিয়া থাকে।” বালিকার সাধ হইল, সেও এইরূপে, ভগবানের পূজা করিয়া, জীবন সার্থক করে।

ত্রিবক্রও কন্যার প্রার্থনা পূর্ণ করিল। ভক্তিমতী দুলালী, প্রাতে ও সন্ধ্যায়, দুই তিন ঘণ্টাকাল অবধি, ভক্তিভরে গুন্‌গুন্‌ স্বরে, সেই পবিত্র তুলসীমঞ্চের তলে বসিয়া, আপন মনে, হরিনাম গান করিত। পার্থিব-চিন্তা, এককালে তাহার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হইল।

ইহা ব্যতীত, ভাগবত ও রামায়ণ-মহাভারতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, বালিকার দৈনন্দিন কার্য্য। কাব্যময় রাজ্যে আসিয়া, কাব্যময় জগতের দৃশ্য দেখিয়া, এবং সেইরূপ কার্য্যে রত থাকিয়া, বালিকার স্বাভাবিক করুণ হৃদয় আরও কোমল-করুণাময় হইয়া উঠিল। এখন ক্ষুদ্র পিপীলিকাটি হইতে মানব-জীবন অবধি, সকলই তাহার আপনার বোধ হইল। ‘পর’ বলিয়া, তাহার কাছে, সংসারে আর কিছুই রহিল না। বালিকা এখন, বৃক্ষের শন্‌ শন্‌ শব্দে, পত্রের মর্ম্মরে, বায়ুর হিল্লোলে সুখ-দুঃখ অনুভব করিয়া থাকে। ক্ষুদ্র মাধবী-বল্লরীটিকে, আ-গাছায় চাপিয়া রাখিলে বালিকা এখন কষ্ট অনুভব করে; যুথিকা-কলিটি শুকাইয়া খসিয়া পড়িলে, সে অন্তরে ব্যথা পায়; কোন বৃক্ষের মূলে কীট প্রবেশ করিয়া, বৃক্ষটি নষ্ট করিলে, তাহার চক্ষে জল পড়ে। পক্ষান্তরে, কপোত কপোতীর সম্মিলনে, ধূল্যবলুণ্ঠিতা দলিতা লতার আশ্রয়-প্রাপ্তিতে, তপন-তাপক্লিষ্ট কুমুদিনীর পুনর্বকাশে, বালিকা, তেমনই সুখানুভব করিয়া থাকে। ফলে ফুলে, বৃক্ষে পত্রে, তৃণে শিশিরে, সকল বস্তুতেই সুকুমারী দুলালী এখন, ভগবানের প্রেমচ্ছবি দেখিতে পায়। সুতরাং সমগ্র পৃথিবীই, এখন তাহার, ‘আপনার’ বোধ হইতে লাগিল। ভাবময়ী

বালিকা, ভাবের পূর্ণোচ্ছ্বাসে, এক একবার তন্ময়ী হইয়া পড়িত। আর প্রকৃতিস্থ হইয়া মনে মনে ভাবিত,—"আহা, এমন সুখের সংসার; তবে মানুষ কেন, 'আপনার-পর' করিয়া, অশান্তিতে ঘুরিয়া মরে! মানাইয়া চলিতে পারিলে, স্বর্গ ত এইখানে!"

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

এখানে আসিয়া, ত্রিবক্র, কন্যার বিবাহের কথা একরূপ ভুলিয়া গিয়াছিল বলিলেই হয়। বাসন্তীপুরে থাকিতে, পাঁচজনে পাঁচকথা কহিত, ভাল-মন্দ উপদেশও দিত, এখানে আর সে বালাই নাই। পতিব্রতা কমলার অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে, এখন সে, এ বিষয়ে, একরূপ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

নরেন্দ্রের সহিত ত্রিবক্রের লীলা-খেলা, সেই পূর্ব্বমতই চলিতেছে। বরং পাপের স্রোত, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। ত্রিবক্র, এক্ষণে সীতারামপুরে অবস্থিতি করিতেছে বলিয়া, নরেন্দ্রের সুখের পথ রুদ্ধ হয় নাই। যেহেতু ত্রিবক্র, দিনের মধ্যে দুই তিন বার, সুহৃৎ-প্রভুর সঙ্গলাভ করিয়া থাকে। বাসন্তীপুর হইতে সীতারামপুরের এই বাগান-বাড়ী পর্য্যন্ত, একটি পাকা রাস্তা আছে। এ রাস্তা, কোম্পানীর নহে,—নরেন্দ্রের নিজ ব্যয়েই ইহা প্রস্তুত হইয়াছিল। নরেন্দ্রের গাড়ী-ঘোড়ার অভাব নাই,—সুতরাং ত্রিবক্র অনায়াসেই, এই উদ্যান-বাটী হইতে, দিনের মধ্যে দুই তিন বার, বাবুর মজ্‌লিস সর্‌গরম করিতে পারিত।

কন্যাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, ত্রিবক্র, দুইজন বিশ্বস্তা পরিচারিকা নিযুক্ত করিয়াছিল। তাহারা সর্ব্বদাই দুলালীর সঙ্গে সঙ্গে ফিরিত। ইহা ব্যতীত, উদ্যান-বাটীর দ্বারদেশে, তিন চারিজন দ্বারবানও পাহারা দিত। তাহাদের উপর ত্রিবক্রের কঠোর আদেশ ছিল যে, উদ্যানের চারিদিক সর্ব্বদা পর্য্যবেক্ষণ করিবে এবং তাহার মধ্যে 'পিপীলিকাটি'ও প্রবেশ করিতে দিবে না।

এত সাবধানেও স্নেহ, নিশ্চিন্ত নহে,—কোন কোন দিন অনির্দ্দিষ্ট সময়ে, ত্রিবক্র, রাজবাটী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিত এবং গুপ্তভাবে, অতি সতর্কতার সহিত, দাস-দাসী, পাচিকা ও দ্বারবান্ প্রভৃতির কার্য্যাবলী পরিদর্শন করিত। কে, কোন্ উদ্দেশে ফিরিতেছে, কাহার মনে কি আছে,—অতি সূক্ষ্মভাবে, সন্দেহসূচক-দৃষ্টিতে, তাহার পরীক্ষা লইত।

ত্রিবক্র প্রতিদিন, রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহরের সময়, নরেন্দ্রের বিলাস-মণ্ডপ হইতে, উদ্যান-বাটীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিত। কোন কোন দিন, তাহার পূর্ব্বেও আসিয়া উপস্থিত হইত। স্ত্রী-বিয়োগ অবধি, একদিনও সে, রাজবাড়ীতে, রাত্রি অতিবাহিত করিত না। প্রাণাধিকা কন্যার জন্য, ত্রিবক্র, সদাই উৎকণ্ঠিত। রাত্রিকালে, তাহাকে একবার না দেখিয়া, সে, শয়ন করিত না।

কোন দিন আসিয়া দেখিত, ক নিবিষ্ট মনে, ভাগবতাদি ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ করিতেছে; অথবা ভক্তিভরে গুন্ গুন্ স্বরে, হরিনাম গানে তন্ময়ী আছে! নয়ত একাগ্রচিত্তে, নৈশ-প্রকৃতির অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া, বিশ্বস্রষ্টার মহামহিমায় মোহিত হইতেছে। কোন দিন বা আসিয়া দেখিত, সুকুমারী কন্যা অঘোর নিদ্রায় অভিভূতা হইয়া পড়িয়াছে। গ্রীষ্মকাল,—বাতায়ন-পথ মুক্ত; নৈশ-সমীর ধীরি ধীরি বহিতেছে। বিমল জ্যোৎস্নালোক, গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে। সে শোভা, অতি মনোহর। লক্ষ লক্ষ হীরকসন্নিভ নক্ষত্রমালা বিভূষিত, বিমল জ্যোৎস্নালোক-পরিপ্লুত অনন্ত নীলাকাশে চন্দ্রমা একদিকে; আর এই সুরম্য হর্ম্ম্যের দ্বিতল কক্ষে,দুগ্ধফেননিভ-সুকোমল-শয্যায়-শায়িতা, সুষুপ্তা—আর একখানি চাঁদমুখ একদিকে! ত্রিবক্র, নির্ব্বিকারচিত্তে, এই দুই চাঁদ-পানে এক একবার চহিয়া দেখিল। কিন্তু, প্রকৃতির চাঁদ অপেক্ষা, প্রাণাধিকা কন্যার চাঁদ মুখখানি, তাহার নিকট অধিক ভাল বোধ হইল। স্নেহ-পরিপ্লুতস্বরে একবার ডাকিল,—"মা দুলাল্!"

উত্তর পাইল না। বুঝিল, বালিকা নিদ্রাভিভূতা হইয়াছে; সুতরাং আর না ডাকিয়া, স্নেহপূর্ণ-হৃদয়ে, অনিমিখ করুণ-নয়নে, তাহার জীবনের সার সর্ব্বস্ব তনয়ার মুখখানি দেখিতে লাগিল। ত্রিবক্র,

একবার আকাশ-পানে চাহে, আরবার দুহিতার সেই নিষ্কলঙ্ক মুখারবিন্দ নিরীক্ষণ করে,—হতভাগ্য, কাহাকে ফেলিয়া কাহাকে দেখিবে, বুঝিতে পারে না! পরিশেষে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, মনে মনে কহিতে লাগিল,—"মা দুলাল্, আমার জীবনসর্ব্বস্ব ধন! তোকে আমি প্রাণ থাকিতে পরের করে তুলিয়া দিতে পারিব না! মারে, তুই আমার সংসারের একমাত্র বন্ধন! তোকে বিলাইয়া দিয়া, কি লইয়া থাকিব? কার মুখ দেখিয়া প্রাণের জ্বালা জুড়াইব, মা! মা দুলাল্! তুমি আমার চির-কুমারীই থাক! এ সংসারে, এমন ভাগ্যবান্ কে আছে, যা'র করে তোমাকে অর্পণ করিয়া, আমি সুখী হইব, মা! সেইজন্যই তোমার বিবাহ দিই নাই, দিবও না। মা আমার! নিষ্ঠুর পিতাকে অভিসম্পাত করিও না!"

এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, হতভাগ্যের চক্ষে জল পড়িত। অতঃপর প্রকৃতিস্থ হইয়া, শয়নাগারে গমন করিত।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

ত্রিবক্র-পরিচালিত নরেন্দ্রের পাপ-বৃত্তির আর নিবৃত্তি নাই। নিত্য-নূতন বিলাস-তরঙ্গে হাবুডুবু খাইয়াও, তাহার ভোগ-তৃষ্ণা মিটিতেছে না,—উত্তরোত্তর আরও বৃদ্ধি পাইতেছে। পাপমতি ত্রিবক্রও, সে প্রাণঘাতী তীব্র-পিপাসার মরীচিকা দেখাইতে লাগিল। তৃষ্ণাতুর নরেন্দ্র কিন্তু আর ধৈর্য্য মানিতে পারিতেছে না। আজ কয়দিন যাবৎ, পাপিষ্ঠের পাপ-বৃত্তির চরিতার্থ হয় নাই। এটুকুও ত্রিবক্রের কৌশল। পাপিষ্ঠ বুঝিত, মধ্যে মধ্যে একটু অভাব-বোধ না হইলে, কোন বস্তুরই গৌরব থাকে না। নরেন্দ্রকে হাতের মধ্যে রাখিয়া, তাহার মনের উপর সম্পূর্ণ প্রভুত্ব করা, ত্রিবক্রের আন্তরিক অভিপ্রায়। এখন, নরেন্দ্রেরও সেই অভাব, অত্যন্ত অধিক বোধ হইয়াছে। তাই আজ সে, উন্মত্তভাবে ত্রিবক্রকে কহিল,—"ভাই, আর আমি স্থির থাকিতে পারি না। তুমি যেরূপে পার, শীঘ্র ইহার প্রতিকার কর।"

বলা বাহুল্য, সে সময়ে, আর কোন পারিষদ তথায় উপস্থিত ছিল না। এমন-সব মন-খোলা কথা কহিবার সময়, কোন পারিষদকে, ত্রিবক্র, সেখানে উপস্থিত থাকিতে দিতও না।

পাপিষ্ঠ ত্রিবক্রও তাহাই চায়। কিন্তু সে ভাব গোপন করিয়া প্রকাশ্যে, একটু ইতস্তত করিয়া কহিল,—"হুজুর, এ বাসন্তীপুরে ত, আর দেখিতে পাই না। ইহার আশ-পাশেও ত, মিলিতেছে না। তাইত, কি করা যায়!"

নরেন্দ্র, অধিক উদ্‌গ্রীবভাবে কহিল,—"তবে উপায় কি! ত্রিবক্র, তোমার পায়ে ধরি, আমাকে রক্ষা কর!"

বলিয়া উন্মত্ত পশু, পাপিষ্ঠ পারিষদের পদদ্বয় ধারণ করিল। ত্রিবক্রও অমনি "কি করেন, কি করেন" বলিয়া, প্রভুকে উঠাইয়া বসাইল। অতঃপর কহিল,—"দেখুন মহারাজ, এক আছে, কিন্তু——"

নরেন্দ্র, আরও ব্যাকুলভাবে কহিল,—"কিন্তু কি? কোথায়? কার——"

সময় বুঝিয়া, ত্রিবক্র, জলন্ত-আগুনে ইন্ধন প্রদান করিল। নরেন্দ্রের মুখের কথা কাড়িয়া লইয়া কহিল,—"বলিব কি হুজুর,—সাক্ষাৎ-পদ্মিনী! এমন রূপ আর দেখি নাই। কিন্তু——"

কামোন্মত্ত পশু, বিকট উল্লাসে লাফাইয়া উঠিয়া, পিশাচ পারিষদের মুখচুম্বন করিল। অতঃপর আহ্লাদে ডগমগ হইয়া কহিল,—"ত্রিবক্র, তবে আর 'কিন্তু' কি? আজই,—কি বল?"

ত্রিবক্র, একটু ইতস্তত করিতে লাগিল। নরেন্দ্র, অধৈর্য্য হইয়া কহিল,—"কে সে দেববালা? সব কথা খুলিয়া বলিতে তুমি এত ইতস্তত করিতেছ কেন, ত্রিবক্র?"

ত্রিবক্র, নানাকথা পাড়িয়া, কামোন্মত্ত পশুকে, আরও কামোন্মত্ত করিয়া তুলিল। যখন বুঝিল, মাছ টোপ গিলিয়াছে,—আর ছাড়াইয়া পলাইতে পারিবে না, তখন কহিল,—"বলিতেছিলাম কি মহারাজ,—আপনি পারিবেন কি? সে পদ্মিনী,—রু-দ্র-না-রা-য়-ণে-র কন্যা। নাম—প্রভাবতী।"

এই কথা শুনিয়া, নরেন্দ্র, ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইল। কোন সুদূর

বিমান-পথ হইতে, নিম্নে পড়িয়া গেল। তাহার হৃদয়ের অন্তস্তলে, একটা দারুণ আঘাত লাগিল। অন্তরাত্মা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। হতাশভাবে, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"কে, রু-দ্র-না-রা-য়-ণে-র ক-ন্যা,—আমার গু-রু-ক-ন্যা ?"

চতুর ত্রিবক্র বুঝিল,—নরেন্দ্র, এতদূর অগ্রসর হইতে ভীত হইতেছে। অমনি পাপিষ্ঠ কিছু শ্লেষ-উপেক্ষাভাবে কহিল,—"তাই বলিতেছিলাম মহারাজ, এ দেববালা ভোগ করা, বড় জোর-কপালের কাজ। যার তার ভাগ্যে, সে সুখ ঘটিবে কেন ?"

নরেন্দ্র, আবার ক্ষণকালের জন্য, নিবিষ্ট-চিত্তে কি ভাবিতে লাগিল। তাহার মনের মধ্যে, একটা তুমুল-সংগ্রাম উপস্থিত হইল। হতভাগা জীবনে অনেক মহাপাপ করিয়াছে বটে, কিন্তু একদিনের জন্য, তাহার অন্তরে, এরূপ ঘাত-প্রতিঘাত হয় নাই। এই অবসরে ত্রিবক্র, তথা হইতে উঠিয়া, কক্ষান্তরে প্রবেশ করিল। এবং তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া, কিছু উৎসাহবাক্যে কহিল,—"মহারাজ, মিথ্যা ও কি ভাবিতেছেন ? আসুন, এই মহৌষধটুকু সেবন করি,—সকল চিন্তা দূর হইবে।"

এই বলিয়া পাপিষ্ঠ, একটি কাচের গেলাসে, খানিকটা সুরা ঢালিল এবং নিজে একটু পান করিয়া কহিল,—"খান মহারাজ,—এইটুকু খাইয়া ফেলুন ;—এখনই সকল ভাবনা দূর হইবে।"

নরেন্দ্র, যেন কলের পুতুলটি। একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—দা—ও।"

দেখিতে দেখিতে, সেই ক্ষুদ্রপাত্রপূর্ণ লাল জল টুকু উবিয়া গেল। সুরও জমিল। একটু পরে, নরেন্দ্র আপনা হইতেই কহিল,—"আচ্ছা ত্রিবক্র, গুরু কি, সংসারে এতই পূজ্য ?"

ত্রিবক্র বুঝিল, ঔষধ ধরিয়াছে ;—এখন সহজেই তাহার মনস্কাম পূর্ণ হইবে। অমনই নানারূপ অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া কহিল,—"হুজুর, আমাকে ও সব কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন ? আমার মত স্বতন্ত্র। গুরু বলুন আর যাই বলুন,—শর্ম্মা এই বুঝেন, আপনার চেয়ে বড় আর কেহ নাই। কথায় বলে,—"আপনি বাঁচলে বাপের নাম !"

নরেন্দ্র চক্ষু বুজিয়া, মাথা দুলিতে দুলিতে কহিল,—"কিন্তু——"

ত্রিবক্র, বাধা দিয়া কহিল,—"ওর আর 'কিন্তু-টিন্তু' নাই মহারাজ! এ কথা,—সাফ্ কথার এক কথা! নিজের সুখের জন্য, খাও-দাও আমোদ কর,—এর আবার গুরু-পুরুত কি? অত শত বাচিতে গেলে, আর আমোদ হয় না,—তার বনে বাস করাই ভাল।"

নরেন্দ্র, নিমরাজী হইয়া কহিল,—"হাঁ—বটে; কিন্তু———"

নরেন্দ্র, আবার কি ভাবিতে লাগিল। এই অবসরে ত্রিবক্র, আবার একটু সুরা ঢালিল। নিজে পান করিল এবং নরেন্দ্রকেও পান করাইল। সুর ক্রমেই চড়িতে লাগিল। নরেন্দ্র কহিল,—"আচ্ছা ত্রিবক্র, যদি আমি এই কার্য্যে রত হই, তাহাহইলে পরিণামে কি হইবে?"

ত্রিবক্র, একটু গম্ভীরভাবে উত্তর করিল,—"সে সুখ, মহারাজ, অদৃষ্টে থাকিলে ত?"

এবার নরেন্দ্র কিছু সাহসভরে কহিল,—"নাই যে, তুমি জানিলে কিরূপে? মনে কর, যদি আমি——"

বলিতে বলিতে কথাটা মুখে বাধিয়া গেল। এবার আর ত্রিবক্রকে দিতে হইল না,—প্রভু স্বয়ং হাতে করিয়া গেলাসে ঢালিয়া, চক করিয়া সেই মহৌষধটুকু উদরসাৎ করিল। ক্রমেই সুর জমিয়া গেল! নরেন্দ্র কহিল,—"মনে কর, যদিই আমি প্রভাবতীকে—বুঝ্‌লে কিনা! তাহাহইলে গুরুদেব কি বলিবেন?"

"বলিবেন আর কি! বুঝিয়াছি মহারাজ!—ইহা আপনার কর্ম্ম নয়।"

বলিয়া ত্রিবক্র একটু বিরক্তি ও উপেক্ষা ভাব প্রকাশ করিল।

নরেন্দ্র কহিল,—"এই মনে কর, রুদ্রনারায়ণ যদি কোন অভিসম্পাত করে?"

ত্রিবক্র ভ্রুকুটী করিয়া কহিল,—"হাঁ,—অভিসম্পাত অমন করে অনেক লোকে! কলিকালে আর শাপ-মন্নিতে কিছু হয় না।"

নরেন্দ্র আবার কহিল,—"আচ্ছা, ধর্ম্মে সহিবে?"

ধর্ম্মের নামে, ত্রিবক্র, চিরদিনই চটা। এবার গর্জ্জিয়া কহিল,—"অত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার করিলে, আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না! নিজের সুখের জন্য ধর্ম্ম কি, আর পাপই বা কি? ও সব কথা আমার ভাল লাগে না মহারাজ!"

এবার নরেন্দ্র, এক নিশ্বাসেই বোতলটি শেষ করিল। অমনি দুনিয়াও ফাঁক বোধ হইল। উপদেষ্টার উৎসাহে প্রমত্ত হইয়া কহিয়া উঠিল,—"ভাল, তাহাই হইবে। ডুবিয়াছি না ডুবিতে আছি! ত্রিবক্র, তোমার কথাই রাখিলাম। এখন যেরূপে পার, আনিয়া দাও—সে পদ্মিনীকে!"

সানন্দে ত্রিবক্র কহিল,—"ইহাকেই ত বলি সখ! যখন যাহা প্রাণ চাহিবে, করিব!"

নরেন্দ্রের অন্তরে যে একটু ঘাত-প্রতিঘাত হইতেছিল, তাহা থামিয়া গিয়াছে! ত্রিবক্রের মন্ত্রৌষধিগুণে, মুহূর্ত্তকাল মধ্যে, সে, উন্মত্ত হইয়া উঠিল। কামোন্মত্ত পশু, বিকটোল্লাসে কহিয়া উঠিল,—"ত্রিবক্র, তুমিই আমার যথার্থ বন্ধু! আমার অভীষ্ট-সিদ্ধির, তুমিই একমাত্র সহায়! প্রাণ দিলেও, তোমার ঋণ পরিশোধ হয় না! এখন যাও, শীঘ্র সে দেববালাকে লইয়া আইস; আমি অধৈর্য্য হইয়া পড়িয়াছি!"

এই বলিতে বলিতে দ্বিগুণ উৎসাহভরে পুনরায় কহিল,—"ত্রিবক্র! তুমিই ঠিক বলিয়াছ! সুখের জন্য, প্রাণ যাহা চাহিবে, করিব। ন্যায়, ধর্ম্ম, অতল জলে নিমজ্জিত হোক। আমার ইহকাল-পরকাল, গভীর আঁধারে ডুবিয়া যাক্,—সুখ চাই, আনন্দ চাই! কে গুরু? কে সে রুদ্রনারায়ণ? তাহাকে ভয় করিব কেন?"

হতভাগ্য নরেন্দ্রের এইরূপ উন্মত্ততা দেখিয়া দুর্ম্মতি ত্রিবক্র, মনে মনে একটু হাসিল। বুঝিল, তাহার দুরভিসন্ধি সিদ্ধ হইয়াছে। পাপিষ্ঠ মনে মনে কহিল—"এইরূপে তোমাকে প্রাণে মারিব; তবে আমার মর্ম্মান্তিক জ্বালা জুড়াইবে!"

প্রকাশ্যে কহিল,—"এই ত মানুষের মত কথা!"

নরেন্দ্র আবার কহিল,—"তবে, আজ রাত্রে, নিশ্চিত?"

"নিশ্চিত।"

"দেখিও, আশা দিয়া, শেষে যেন নিরাশ করিও না।"

পাপিষ্ঠ একটু হাসিয়া উত্তর করিল,—"ত্রিবক্র সরকারের যে কথা, সেই কাজ!"

বস্তুতঃ, তাহাই হইল। সেই দিন গভীর নিশীথে, পাপিষ্ঠ ত্রিবক্রের ষড়যন্ত্রে কামোন্মত্ত পিশাচ নরেন্দ্র কর্ত্তৃক, সতীর সর্ব্বস্ব-ধন অপহৃত হইল! আকাশ, এ সময় তোমার বজ্র কোথায়?

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ।

রুদ্রনারায়ণ সার্ব্বভৌম একজন মহাতান্ত্রিক। তাঁহার জ্ঞান, গবেষণা, পাণ্ডিত্য ও ঐশী-ভক্তি দেশ-বিখ্যাত। বাসন্তীপুরেই তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ, সাধনগুণে, সাধারণ্যে গণ্য-মান্য হইয়া গিয়াছেন। লোক-সমাজে, রুদ্রনারায়ণেরও সেই সম্ভ্রম অটুট আছে। তিনি, নরেন্দ্রের কুল-গুরু। নরেন্দ্রের স্বর্গীয় জননী, তাঁহাকে দেবতার ন্যায় ভক্তি করিতেন। পুত্র নরেন্দ্রনারায়ণ কিছু ইংরাজী-মেজাজী হইতেছে বুঝিয়া, বৃদ্ধা, মৃত্যুকালে, কুল-গুরুকে ডাকাইয়া আনিয়া, তাঁহার চরণে পড়িয়া, অতি কাকুতি-মিনতি করিয়া বলিয়া গিয়াছিলেন যে, নরেন্দ্র, ঘোর আচারভ্রষ্ট ও অসদ্‌বৃত্ত হইলেও, তাঁহার শ্বশুরকুলের গুরুপদ যেন রুদ্রনারায়ণ পরিত্যাগ না করেন। বৃদ্ধার বিশ্বাস ছিল, যে দিন কুলগুরু নরেন্দ্রের প্রতি বাম হইবে, সেই দিন হইতে তাহার মহা সর্ব্বনাশ ঘটিবে। রুদ্রনারায়ণও ভক্তিমতী পতিব্রতার অন্তিম-অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হন।

তাই এতদিন, তিনি, নরেন্দ্রের সহস্র প্রকার ত্রুটী সত্ত্বেও, তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। নরেন্দ্রের পৈশাচিক কার্য্য-কলাপ দেখিয়া-শুনিয়া, এক একদিন তিনি রাগ করিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিতেন,—"আজ হইতেই এ অধম-শিষ্যকে ত্যাগ করিব।" আবার তখনই বৃদ্ধার অন্তিমকালের সেই মিনতি, স্মৃতিপথে উদয় হইয়া, তাঁহার সঙ্কল্প-সাধনে বাধা দিত। এজন্য তিনি লোক-বিশেষের নিকট, পক্ষপাতী, অর্থলোভী, ভণ্ড প্রভৃতি বিশেষণে বিভূষিত হইতেন।

সুবিধা পাইলেই রুদ্রনারায়ণ নরেন্দ্রকে বুঝাইতেন এবং অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিয়া, সৎপথে আসিতে উপদেশ দিতেন। অধিকন্তু, দিন দিন তাহার বিষয়-সম্পত্তি নষ্ট হইতেছে এবং পিতার কীর্ত্তি-কলাপ লোপ

পাইতেছে, এ কথাও বুঝাইয়া বলিতেন। এক একদিন, তাহার মাতার অন্তিমকালের কথা উল্লেখ করিয়া ঈষৎ ভর্ৎসনা-বাক্যেও কহিতেন,—"দেখ নরেন্দ্র, আমি তোমার কুল-গুরু;—পুনঃপুনঃ তোমাকে পাপ-পথে প্রবৃত্ত হইতে নিষেধ করিতেছি, তুমি শুনিতেছ না;—কিন্তু বার বার এরূপ হইলে, চাই কি, আমি তোমার মায়ের অনুরোধও রক্ষা করিতে পারিব না। তোমার মত শিষ্য থাকায়, আমার কলঙ্ক আছে!" কিন্তু কে, সে কথায় কর্ণপাত করে? যাহার হৃদয়ে মূর্ত্তিমান্ শনি আশ্রয় করিয়াছে, তাহাকে সুমতি প্রদান করে, কাহার সাধ্য?

রুদ্রনারায়ণের তিনটি কন্যা; তন্মধ্যে প্রভাবতী—কনিষ্ঠা। প্রভাবতীর বয়স ১৬।১৭ বৎসর হইবে। যুবতী—পরমা সুন্দরী। এই সৌন্দর্য্যই হতভাগিনীর কাল হইয়াছিল।

রুদ্রনারায়ণ, এই কনিষ্ঠা কন্যাটিকে অধিক ভাল বাসিতেন। তাই প্রভাবতী অধিকাংশকাল পিত্রালয়ে বাস করিত। বিশেষ, তাহার স্বামী, বিদেশে—কর্ম্মস্থানেই অধিক দিন থাকিতেন;—এ কারণও রুদ্র-নারায়ণ, প্রাণাধিকা কন্যাকে, আপনার কাছে রাখিয়া দিতেন।

পাপিষ্ঠ ত্রিবক্র, বাসন্তীপুরের সকলের ঘরের, সকল খবরই রাখিত। এতদিন, অক্ষম প্রতিবাসীদিগের সর্ব্বনাশ করিয়া আসিয়াছে, এখন ক্ষমবানের উপরও সেই অত্যাচার আরম্ভ করিল। রুদ্রনারায়ণের কন্যাই তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ। বলা বাহুল্য, পূর্ব্ব হইতেই পাপিষ্ঠের মনে, এই পাপ-অভিসন্ধি জাগিতেছিল এবং কিরূপে এই পাপ-কার্য্য সাধন করিবে, তাহার উপায়ও উদ্ভাবন করিয়া রাখিয়াছিল। এই নিদারুণ দুর্ঘটনের দিন, ত্রিবক্র, লোকজন সংগ্রহ করিয়া, রুদ্রনারায়ণের বাটীতে ওৎ পাতিয়া বসিয়া ছিল। সন্ধ্যার পর, প্রভাবতী, খিড়কীর ঘাট সরিতে আসিলে, পাপিষ্ঠেরা, বস্ত্র দ্বারা, তাহার মুখ বাঁধিয়া লইয়া যায়। অতঃপর, যথাসময়ে, সেই কুলবালাকে, পিশাচ-প্রভুর ভোগে অর্পণ করে।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

এই নিদারুণ সংবাদে, মহাতান্ত্রিক রুদ্রনারায়ণ, ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইলেন। তাঁহার মস্তকে, আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। যেন এককালে, শত সহস্র বৃশ্চিক তাঁহাকে দংশন করিল। মর্ম্মান্তিক যাতনায় চীৎকার করিয়া, ব্রাহ্মণ, আকাশপানে চাহিয়া কহিলেন,—"মা সর্ব্বমঙ্গলে, এ, কি করিলে? চিরদিন, কায়-মনঃ-প্রাণে, তোমার শ্রীচরণ সেবা করিয়া আসিতেছি,—কি পাপে, আমার এ সর্ব্বনাশ ঘটিল মা!"

বলিতে বলিতে শোকে, দুঃখে, অপমানে, অভিমানে, মর্ম্মান্তিক যাতনায়, ব্রাহ্মণের চক্ষে, দরবিগলিতধারে অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। অমনি কাঁপিতে কাঁপিতে অঙ্গরাগ মুছিয়া ফেলিয়া, বক্ষে করাঘাত করিয়া, আবার কহিলেন,—"দেখ্ মা! বুক চিরিয়া,—আমার প্রাণে কি দারুণ দাবানল জ্বলিতেছে! মা চৈতন্যরূপিণি! কোন্ পাপে তুই ভক্ত-পুত্রের প্রতি বাম হইলি মা? প্রভাবতি, মারে! কেন তোর জননী-জঠরে মৃত্যু হইল না?"

শোকাবেগ একটু প্রশমিত হইলে রুদ্রনারায়ণের সেই রুদ্রমূর্ত্তি বড়ই ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিল। তাঁহার চক্ষু ঘূর্ণিত হইল; মস্তকের কেশ-রাশি কাঁপিয়া উঠিল; ললাটস্থ রক্তচন্দন-প্রলেপিত ত্রিপুণ্ড্রক, কুঞ্চিতাকার ধারণ করিল; মুখ আরক্তিম হইল; দীর্ঘ শ্মশ্রু দলমল করিতে লাগিল; সর্ব্ব শরীর দৃঢ় হইয়া শিরাগুলি স্ফীত ও প্রতি লোমকূপ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। রুদ্রমূর্ত্তিতে অগ্নি গর্জ্জিয়া উঠিল। অমনি গলদেশস্থ যজ্ঞোপবীত ও সিন্দুর-শোভিত রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়া, ঊর্দ্ধহস্তে, কম্পিত কলেবরে কহিলেন,—"মা রুদ্রেশ্বরি! যদি তোর পদে তিলার্দ্ধ ভক্তি থাকে, তবে দেখ্ মা, আজ কিরূপে বৈর-নির্যাতন করি!"

এই বলিয়া, জ্বলন্ত পাবকের ন্যায়, রুদ্রমূর্ত্তিতে, ত্বরিত-পদে রুদ্রনারায়ণ, নরেন্দ্র ও ত্রিবক্রের উদ্দেশে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণের সে উন্মত্ত ভৈরব-মূর্ত্তি দেখিয়া, সকলে চমকিত হইল। পথের দুইপার্শ্বে লোক জমিয়া গেল। কিন্তু কেহই সাহস করিয়া, তাঁহাকে কোন কথা বলিতে পারিল না।

দেখিতে দেখিতে, সে অগ্নি, নরেন্দ্রের বাটীর সম্মুখে আসিয়া, উপস্থিত হইল। দৌরারিকগণ, সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া, ভয়-বিস্ময়ে, বিনা বাক্যব্যয়ে, দ্বার ছাড়িয়া দিল। তিনি, কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া, একেবারে নরেন্দ্রের বৈঠকখানা-গৃহে উপস্থিত হইলেন।

নরেন্দ্র, তখন পারিষদমণ্ডলী লইয়া, রঙ্গ-রসালাপে মত্ত ছিল। পার্শ্বে, পাপিষ্ঠ ত্রিবক্র বসিয়া, পিশাচ-প্রভুর গুণ-গরিমা ও সাহস-নির্ভীকতার সাধুবাদ প্রদান করিতেছে এবং প্রকারান্তরে, নিজ ক্ষমতা ও বুদ্ধি-কৌশলের পরিচয় দিতেছে। অর্থাৎ কিরূপে সে, রুদ্রনারায়ণের কন্যাকে, রাজভোগে অর্পণ করিয়াছে এবং নরেন্দ্রই বা কিরূপে অতুল সাহসে, সে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিল, সেই সকল গুণ-গরিমা ব্যাখ্যা করিয়া, বাহাদুরী প্রকাশ করা হইতেছে। পাপিষ্ঠ আজ আবার কাহার সর্ব্বনাশ করিবে, সে বিষয়েও পরামর্শ চলিতেছিল।

এমন সময় রুদ্রনারায়ণ, সেই রুদ্রমূর্ত্তিতে, তথায় উপনীত হইলেন। অকস্মাৎ, জ্বলন্ত-আগুন সম্মুখে দেখিয়া, পাপিষ্ঠগণ ভীত, চকিত ও স্তম্ভিত হইল। নরেন্দ্রের অন্তরাত্মা, দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ত্রিবক্রও ক্ষণকালের জন্য, বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পড়িল। কাহারও মুখে আর কথাটি ফুটিল না।

রুদ্রনারায়ণ, বজ্রগম্ভীরস্বরে কহিলেন,—"নরেন্দ্রনারায়ণ!——"

সে স্বর, বিস্তৃতকক্ষে প্রতিধ্বনিত হইল; সমস্ত গৃহ যেন তাহাতে কাঁপিয়া উঠিল। সুদূর বিমানে তাহার প্রতিঘাত হইল; বৃক্ষের পত্রে পত্রে তাহা ঝঙ্কার করিল। আর এই হতভাগ্যগণের হৃৎতন্ত্রীতে, সে স্বর স্পর্শ করিয়া, মুহূর্ত্তকালের জন্য, পরিণাম-চিন্তা আনিয়া দিল।

আগুন গর্জ্জিয়া উঠিল,—"নরেন্দ্রনারায়ণ, পাষণ্ড, পিশাচ, তোর এ কি কাজ!"

বলিতে বলিতে, তেজস্বী ব্রাহ্মণের চক্ষু হইতে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইতে লাগিল। ক্রোধে, দুঃখে, অভিমানে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল। ভয়ে, নরেন্দ্রের মুখ শুকাইয়া গেল। বধ্য-ভূমে উপনীত ছাগ-শিশুর ন্যায়, তাহার সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল। দারুণ-সন্ত্রাসে, হত-ভাগ্য, তথা হইতে পলাইবার চেষ্টা করিল।

আগুন, আবার দ্বিগুণবেগে গর্জ্জিয়া উঠিল,—"পলাইবি কোথায় মূঢ়! স্বয়ং শিব আসিলেও, আজ তোকে রক্ষা করিতে পারিবেন না! হায়, বজ্র কোথায়? এখনও তোর মুণ্ড ভূমিসাৎ হইল না!"

নরেন্দ্র, কম্পিতকণ্ঠে কহিল,—"গু—রু—দে—ব!——"

রুদ্রনারায়ণ ভ্রুকুটী করিলেন। গর্জ্জিয়া কহিলেন,—"কে তোর গুরু?—পিশাচের গুরু—রুদ্রনারায়ণ?"

আগুনের তেজ দেখিয়া, নরেন্দ্রের বাক্‌রোধ হইল।

অতঃপর, সেই অগ্নি, ত্রিবক্রের দিকে অগ্রসর হইল,—"ত্রিবক্র, নরকের কীট! তোর কি, ধর্ম্মের ভয় নাই? প্রাণের মমতা নাই? দুর্ব্বৃত্ত, পিশাচ!—"

আগুনের বেগ, ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

ত্রিবক্র, এতক্ষণ, মনে মনে গর্জ্জিতেছিল। এইবার ধর্ম্মের নামে, তাহার হৃৎ-তন্ত্রী কাঁপিয়া উঠিল। পাপিষ্ঠের হৃৎপিণ্ড কে যেন টানিয়া বাহির করিল! অমনি দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্য হইয়া, উন্মত্তভাবে কহিয়া উঠিল,—"কে তুই দুষমন, ধর্ম্ম-ভয় দেখাইতে আসিয়াছিস? এখনই, এই মুহূর্ত্তে, এখান হইতে দূর হ। নহিলে, অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিব।"

আগুন আবার হো-হো-রবে, অট্টহাস্যে গর্জ্জিয়া উঠিল,—"এ নরকে যখন আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তখন আর আমার মান-অপমান কি? কিন্তু নিশ্চয় জানিস্ পাপিষ্ঠ, ধর্ম্ম আছে! মানুষের হাত এড়াইতে পারিতেছিস্ বলিয়া ক্রমেই তোর বুকের পাটা বাড়িতেছে। কিন্তু পিশাচ, ধর্ম্মের হাত এড়াইবি কিরূপে? চিরদিন তুই ধর্ম্মকে নষ্ট করিয়া আসিতেছিস, এইবার ধর্ম্ম তোকে নাশ করিবে! এ কথা নিশ্চিত জানিস!"

ত্রিবক্র দেখিল, আগুনের বেগ ক্রমেই ভীষণ হইতে ভীষণতর হইতেছে! ভাবিল, তবে ইহাতে আরও ইন্ধন প্রদান করি। দেখি,—ইহার চরম-সীমা কোথায়!

এই ভাবিয়া পাপিষ্ঠ, তাহার সেই স্বাভাবিক কঠোর ব্যঙ্গস্বর অধিকতর কঠোর ও মর্ম্মভেদী করিয়া কহিল,—"তা সার্ব্বভৌম ঠাকুর, চট কেন? বলি, আর কি কারও হয় না? সংসারে বাস করিতে গেলে,

এমন ভাল-মন্দ হইয়াই থাকে। সে জন্য আর এত কেন! কিছু টাকা-কড়ির প্রয়োজন আছে কি?"

আগুনে বিজলী খেলিল। ব্রাহ্মণের চক্ষে অগ্নি ঝলসিতে লাগিল। সেই রুদ্রমূর্ত্তি আরও ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল। মুখ, আরক্তিম হইয়া, ঘন ঘন নিশ্বাস পড়িতে লাগিল। দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া, মর্ম্মাহত পিতা, কাঁপিতে কাঁপিতে কহিলেন,—"পি—শা—চ!—"

ক্রোধে তাঁহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না,—অন্তরের কথা, একটা বিকট-নিশ্বাসেই লীন হইল। পাপিষ্ঠ ত্রিবক্র, ব্রাহ্মণকে তদবস্থায় দেখিয়া, আরও মর্ম্মভেদী বিদ্রূপ করিয়া কহিল,—"দেখো ঠাকুর, বেশী চোটে যেন ফেটে মরো না!"

অতঃপর, একবার নরেন্দ্রের পানে তাকাইয়া, ও অন্যান্য পারিষদের মুখের দিকে চাহিয়া, পাপিষ্ঠ সেই মর্ম্মাহত পিতাকে শতগুণে মর্ম্মাহত করিয়া কহিল,—"তা রাগ্ কেন ঠাকুর? অমন সোণার প্রতিমাকে জন্মের-মত কোন্ বানরের পায়ে দিয়াছ, তাহা সহিতে পার,—আর আমরা না হয় একদিন সখ্ ক'রে সে পদ্মিনীকে রাজভোগে অর্পণ করিয়াছি;—এ টুকু আর সহিতে পার না! দুঃখ কি ঠাকুর,—তুমি ত এখন রাজ-শ্বশুর হইয়াছ;—বল ত, তোমার কন্যাকেও, চিরদিনের মত রাজরাণী করিয়া দিতে পারি।"

সমুদ্রে বাড়বাগ্নি হইল: সেই প্রজ্বলিত মহা আগুনে আবার আহুতি পড়িল। রুদ্রমূর্ত্তি রুদ্রনারায়ণ যজ্ঞোপবীত ধরিয়া, ইষ্ট-মন্ত্র জপ করিলেন। মনে মনে কহিলেন,—"যদি আমি যথার্থ ব্রাহ্মণ হই, ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রী জপ করিয়া থাকি,—আর মা চণ্ডিকে! দিনান্তে যদি একবারও কায়-মনঃ-প্রাণে তোমায় ডাকিয়া থাকি, তবে যেন মা! আমার বাক্য ব্যর্থ না হয়।"

অতঃপর কাঁপিতে কাঁপিতে সেই মূর্ত্তিমান অগ্নি গর্জ্জিয়া উঠিয়া ঊর্দ্ধ হস্তে অভিসম্পাত করিলেন,—"পিশাচ! তুই আমার বুকে আজ যে কালী দিলি, চিতানলেও ইহা লোপ পাইবে না! মূঢ়, তোকে আর কি বলিব,—যেন অচিরাৎ, আমার-মত দশা তোর হয়! আশীর্ব্বাদ করি, সে অবধি তুই বাঁচিয়া থাকিবি!"

অতঃপর, অতি কষ্টে, দুই ফোঁটা উত্তপ্ত অশ্রু মুছিয়া, সেই জ্বলন্ত আগুন নরেন্দ্রকে গ্রাস করিতে আসিল। অগ্নির চক্ষু, ধক্ ধক্ জ্বলিতে লাগিল। যেন, হর-কোপানলে পড়িয়া, মদন ভস্ম হইতেছে!

নরেন্দ্র, সে ব্রহ্মতেজ সহ্য করিতে পারিল না,—চক্ষু আবৃত করিয়া রহিল। আগুন গর্জ্জিয়া উঠিল,—"যেন অচিরে, বজ্রাঘাতে তোর মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়!"

আগুন, অন্তর্হিত হইল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

দুইদিন কাটিয়া গেল। এই দুইদিন নরেন্দ্র, কিছু ভীত ও সঙ্কুচিত-ভাবে অবস্থান করিল। আজ ত্রিবক্র, তাহাকে বিধিমতে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। উপেক্ষাভাবে হাসিয়া কহিল,—"মহারাজ, আপনি অত উতলা হইতেছেন কেন? কলিতে কি দেবতা-বামুন আছে যে, তাহাদের অভিশাপ ফলিবে! ইংরেজের দপ্‌দপানীতে, তারা সব, দেশ ছাড়িয়া পলাইয়াছে!"

নরেন্দ্র, একটি দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া, ক্ষুণ্ণভাবে কহিল,—"না ত্রিবক্র,—তাহা নয়। তুমি রুদ্রনারায়ণকে চিন না,—তাই এরূপ কথা বলিতেছ। মার মুখে শুনিয়াছি, রুদ্রনারায়ণের মত নিষ্ঠাপরায়ণ ব্রাহ্মণ, এ কালে বড় কম। কালী নাকি তাকে, প্রত্যক্ষ দেখা দেন!"

শুনিয়া ত্রিবক্র, হাসিয়া উঠিল। উপেক্ষাভাবে কহিল,—"মহারাজ, ইহাকে বলে—রূপকথা! ঠাকুর-মা-দিদি-মার মুখেই ইহা শুনিতে ভাল।"

পরে, নানারূপ অঙ্গ-ভঙ্গী করিয়া কহিতে লাগিল,—"ভণ্ড বামুনগুলা কি চতুর! বেদ পুরাণ, তন্ত্র মন্ত্র, মাথামুণ্ড কতই-কি করিয়া গিয়াছে। অমুক করিলে পাপ, অমুক করিলে পুণ্য; এটায় ধর্ম্ম, সেটায় অধর্ম্ম—কত বজরুকিই খেলিয়া গিয়াছে! আবার স্বর্গ নরক, ইহকাল পরকাল, নির্ব্বাণ মোক্ষ—বলিহারি চতুরালী! কি বলিব, একবার আমার হাতে, ইংরেজ, রাজত্বটা দেয়!——"

নরেন্দ্র, একটু ভ্রুকুটী করিয়া, ক্ষুণ্ণ মনে কহিল,—"কিন্তু যা' বল ত্রিবক্র, এ দুইদিন অবধি আমার মনটা বড় খারাপ হইয়া আছে। ব্রাহ্মণ, মুখের উপর অত-বড় শাপটা দিয়ে গেল!"

ত্রিবক্র, আরও উৎসাহভরে কহিল,—"মহারাজ ও কলির বামুন মুখ-সর্ব্বস্ব,—মহারাজ, মুখ-সর্ব্বস্ব! মুখে, এমন অনেক কথাই বলে। আমিও মনে মনে, এ রকম শাপ-মন্নি দিই অনেককে। সকলের সকল কথা যদি ফলিত, তা' হইলে আর ভাবনা ছিল কি!"

অতঃপর, একটু বুক ফুলাইয়া, গর্ব্বভরে কহিল,—"হুজুর, আমিও তাকে যে, কাটা-ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়াছি, তাতেই যথেষ্ট হইয়াছে।"

পাপিষ্ঠ দেখিল, কিছুতেই নরেন্দ্র প্রফুল্ল হইতেছে না। সহজে রোগ ছাড়িবে না বুঝিয়া, অমনি সে, পার্শ্বের কক্ষে উঠিয়া গেল। তখনই আবার রোগের ঔষধাদি লইয়া প্রবেশ করিল। কহিল,—আসুন মহারাজ, আজ একটু ভাল ক'রে আমোদ করা যাক, দু'দিন যেন কেমন ফাঁকা-ফাঁকা বোধ হইতেছে!"

নরেন্দ্র একটি নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"ত্রিবক্র, তুমি বল্‌ছ বটে, কিন্তু আমার মনটা কেমন কচ্ছে।"

"ও কিছু নয়" কহিয়া ত্রিবক্র, গেলাসে একটু সুরা ঢালিল, নরেন্দ্রও 'দেবে,—দাও" বলিয়া ঢক করিয়া গলাধঃকরণ করিল। স-প্রভু পারিষদ-বর্গও সেই সর্ব্বচিন্তা-বিনাশিনী বিরামদায়িনী, বিলাতী সুধার আস্বাদ লইতে লাগিল। ঔষধ ধরিয়া আসিল, রোগও ছুটিয়া গেল।

এক একটি করিয়া, দুই তিনটি বোতল ভূমে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। সুর বেশ জমিয়াগেল। নরেন্দ্রের চক্ষে সকলই আবার প্রফুল্ল বোধ হইল।

ঔষধ ধরিয়াছে বুঝিয়া, ত্রিবক্র আর-আর পারিষদকে কি একটু ইঙ্গিত করিল; তাহারাও একে একে, তথা হইতে, অন্তর্হিত হইল।

নরেন্দ্র, জড়িতস্বরে কহিল,—"ত্রিবক্র, তুমি ঠিক বলিয়াছ, শাপ-মন্নি, ও কিছু নয়,—কেবল সুখ লুট, আর মজা কর!"

ত্রিবক্রও সময় বুঝিয়া একটু অভিমানসুরে কহিল,—"হুজুর, আপনার জন্য আমি প্রাণপাত করিতেছি, তবুও আপনি আমার উপর খুসী নন, এই দুঃখ!"

নরেন্দ্র, জড়িতস্বরে উত্তর করিল,—"এমন কথা বলিও না, ত্রিবক্র। তোমার কাছে আমি, আজীবন ঋণী !"

আবার কিছুক্ষণ ধরিয়া ঔষধ চলিতে লাগিল। মদিরাপানে কামোন্মত্ত পশু গর্জ্জিয়া উঠিল। কহিল,—"ত্রিবক্র, দুই দিন অবধি একরূপ উপবাসী আছি বলিলেই হয়। আর পারি না।—আমার আজিকার উপায় কি করিবে, বল দেখি ?"

ত্রিবক্র, হাসিতে হাসিতে কহিল,—"তাহা না করিয়া কি, নিশ্চিন্ত আছি। আজ প্রভাবতী বা কোথায় লাগে !"

"বটে !—এমন !" বলিয়া কামোন্মত্ত পশু লাফাইয়া উঠিল। পরে কহিল,—"কে—কে ? বলত—বলত !"

ত্রিবক্র হাসিতে হাসিতে কহিল,—"হুঁ, হুঁ—মহারাজ। সে একটি চাঁপাকলি ! মাধব ঘোষকে চেনেন ত !—তার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী—বিরাজমোহিনী।"

"তাকে হাতাইবে কিরূপে ?—মাধবের বাটীতে না অনেক স্কুলের ছেলে থাকে ?"

"সে সন্ধান কি অগ্রে না লইয়াছি ! আজ অমাবস্যা, মাধব ঘোষ আজ সন্ধ্যার পর, সস্ত্রীক, চামুণ্ডার পূজা দিতে যাইবে। বেটার কি, মানসিক আছে।"

"ভাল, তারপর ?"

"তারপর আর কি,—সীতারামপুর একেই নির্জ্জন,—যেমন পূজো দিয়ে ফিরিতে থাকিবে, অমনি কার্য্যসিদ্ধি !"

"যদি ধরা পড় ? তুমি বাগান-বাড়ীতে থাক, সকলে জানে। হঠাৎ তোমার উপর সন্দেহ করিতে পারে।"

"আজ, আমি আর সঙ্গে থাকিব না। লোকজন সব বন্দোবস্ত করিয়া দিব ;—তাহারাই কার্য্যোদ্ধার করিবে।"

নরেন্দ্র একটু ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া কহিল,—"কথাটা, আমার কেমন ভাল লাগিতেছে না ! তুমি সঙ্গে থাকিবে না—"

"কাঠের বিড়াল হোক,—আপনার ত, ইঁদুর ধরিতে পারিলেই হইল !"

"কিন্তু—"

"কিন্তু কি? শর্ম্মা ত্রিবক্রের চক্র ভেদ করা, বড় কঠিন কথা! মন্দিরের পাশেই বন, তার পরেই খাল ;—অন্ধকারে, নির্ব্বিঘ্নে শিকার মিলিবে! আমি, এখনই সব বন্দোবস্ত করিতেছি।"

এবার নরেন্দ্র, আহ্লাদে আটখানা হইল। কহিল,—"ত্রিবক্র, তুমিই আমার যথার্থ বন্ধু!"

ত্রিবক্র, মনে মনে কহিল,—"এমনে ত মরিয়াছি,—তবে তোমাকে ভালরূপে উচ্ছিন্ন দিয়া মরি।"

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

আজ অমাবস্যা। সীতারামপুরের কালী-মন্দির, আজ অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছে। চারিদিক পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। মন্দির-সোপানের দুই পার্শ্বে যে সকল ক্ষুদ্র তৃণ-কণ্টক-লতাদি আবর্জ্জনা জন্মিয়াছিল, তাহা চাঁচিয়া-ছুলিয়া পরিষ্কার করা হইয়াছে। মন্দিরের গায়ে যে সমস্ত শেওলা ও আরণ্যলতা আশ্রয় লইয়াছিল, তাহাও সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে। যে দুই এক স্থান একটু-আধটু ভাঙ্গিয়া খসিয়া পড়িয়াছিল, তাহাও সংস্কৃত হইয়াছে। অধিকন্তু, এক পোঁচ কলি-চূণে সমস্ত সাফ্ হইয়া, মন্দিরটি, নববেশ ধারণ করিয়াছে।

মন্দিরের শিখরদেশে—ত্রিশূলোপরি একটি লাল-পতাকা শোভিত হইয়াছে, বায়ুভরে, তাহা পত পত রবে উড্ডীন হইতেছে। মন্দিরের দ্বারদেশে, চুন-বালির অক্ষরে, একটি সংস্কৃত শ্লোক লিখিত আছে। সে শ্লোকের তাৎপর্য্য,—"কলিতে, কালীই সার ; কাল-ভয়হরা কালী-পদ অবলম্বন ভিন্ন, কলির-জীবের পরিত্রাণ নাই।"

মন্দিরের ভিতরের শোভা, আরও অপূর্ব্ব। ঠিক মধ্যস্থানে, ভীমা, ভয়ঙ্করী, পাষাণ-প্রতিমা বিরাজিতা। কালিকার চারিহস্তে, বরাভয়-মুণ্ড-অসি ; চরণতলে শ্মশানচারী সদাশিব ; গলে মুণ্ডমালা সুশোভিত। এলোকেশী, উলঙ্গিনী তারা, তিমির বরণে বিকটদশনে লোল-জিহ্বা

বিস্তার করিয়া আছেন। যেন রৌদ্রে ভয়ানকে, বীভৎসে অদ্ভুতে মিশিয়া দনুজদলনী, কাত্যায়নী, ইহজগতে কার্য্যের ফলাফল দেখাইতেছেন!

প্রতিমার পাদপদ্মে, স্বর্ণাক্ষরে খোদিত আছে,—"মহামেঘপ্রভাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুর্ভুজাং"। রাঙ্গা-জবা ও সচন্দন বিল্বদলে, সে স্থান আবৃত হইয়া পড়িয়াছে।

মন্দির-প্রাঙ্গণে, ঠিক প্রতিমার সম্মুখবর্ত্তী স্থানে একটি যূপকাষ্ঠ প্রোথিত আছে। আজ তাহা সিন্দূরে সুশোভিত হইয়া, যেন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে হাসিয়া উঠিতেছে। আজ সন্ধ্যার পর, ষোড়শোপচারে, চামুণ্ডার পূজা হইবে।

বাসন্তীপুরের মাধবনারায়ণ ঘোষের একটী মানসিক আছে। তাঁহারই ব্যয়ে, চামুণ্ডা-মন্দির, আজ সুশোভিত। মাধবনারায়ণ, একজন সঙ্গতি-পন্ন গৃহস্থ। পূর্ব্বে তিনি, কোম্পানীর সদর-ওয়ালার কার্য্যে, বাহাল ছিলেন; এক্ষণে পেনৃসন পাইয়া, বাটী-অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রী গতাসু হওয়ায়, তিনি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। মধ্যে, তাঁহার কোন উৎকট রোগ হইয়াছিল; ঈশ্বরেচ্ছায় তাহা হইতে মুক্ত হন। তাই আজ সস্ত্রীক, কালী-মন্দিরে যাইয়া ষোড়শোপচারে পূজা দিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন।

পল্লীগ্রামে কোন একটি সামান্য উৎসব হইলেও সাধারণের চিত্তা-কর্ষণ করিয়া থাকে। কালী মন্দির সংস্কৃত হইতেছে দেখিয়া, লোক-পরম্পরায় প্রচারিত হইল, মাধবনারায়ণ, অমুক অমাবস্যার রাত্রে, সস্ত্রীক, মহা ধুম-ধাম করিয়া, মায়ের পূজা দিতে যাইবেন।

তাই আজ প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ন অবধি, দলে দলে স্ত্রী-পুরুষ আসিয়া, দেবী-দর্শন করিয়া যাইতে লাগিল। মাধবনারায়ণও পূর্ব্ব হইতে, ভারবাহী দ্বারা, স্তরে স্তরে, স্তূপে স্তূপে পূজোপকরণ দ্রব্যাদি পাঠাইতে লাগিলেন। পূজক ব্রাহ্মণ শুদ্ধাচারে, সংযতচিত্তে, পূজার কাল অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে সংবাদ আসিল, পূজক, যথাসময়ে পূজা আরম্ভ করিয়া দিবেন,—মাধবনারায়ণ উপস্থিত হইতে পারিবেন না,—হঠাৎ তাঁহার স্ত্রী, বিসূচিকারোগে আক্রান্তা হইয়াছেন।

এ সময়, দর্শক-সমাগম এককালে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কালী-

মন্দির, কোলাহল-পরিশূন্ত হইয়াছে। সীতারামপুর যে নির্জ্জন, সেই নির্জ্জন স্থানে পরিণত হইল।

এদিকে পাপিষ্ঠ ত্রিবক্র, পূর্ব্ব হইতে, লাটিয়াল ও বিশ্বস্ত অনুচর-বর্গকে, গুপ্তভাবে তথায় পাঠাইয়া দিয়াছে। এই ভাবে কহিয়া দিয়াছে, সন্ধ্যার সময় কোন রূপবতী যুবতীকে চামুণ্ডা-মন্দিরে দেখিলেই তাহারা আক্রমণ করিবে এবং রাজভোগে আনিয়া দিবে। কৃতকার্য্য হইতে পারিলে, তাহারা অন্যান্য দিন অপেক্ষাও অধিক পুরস্কৃত হইবে, একথাও পাপিষ্ঠ বলিয়া দিয়াছে। অনুচরবর্গও ত্রিবক্রের শিক্ষানুযায়ী, খালে ডিঙ্গি ডুবাইয়া রাখিয়া, অপরাহ্ণ হইতেই মন্দির পার্শ্বস্থ গুল্মবনে ওৎ পাতিয়া বসিয়া রহিল এবং অতি সাবধানে, উদ্গ্রীব ভাবে, শিকারের অপেক্ষা করিতে লাগিল।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, এমন সময় দুলালী, একজন পরিচারিকাকে কহিল,—"ঝি, আজ না অমাবস্যা ?"

পরিচারিকা কহিল,—"হাঁ, দিদি ঠাকরুণ।"

"আহা, আজ মার-মন্দিরে বড় ধূম হবে,—না ?"

"ধূম ব'লে ধূম ! আজ নাকি এক কুড়ি পাঁটা ও মোষ বলি হ'বে। বাসন্তাপুরের মাধব বাবু, আজ পরিবারকে নিয়ে পূজা দিতে আস্‌বেন। তাঁদের কি মানসিক আছে।"

"এখন মার মন্দিরে, বেশী লোকজন আছে বোধ হয় ?"

"না—মাকে দেখে সকলে বেলাবেলি বাড়ী চ'লে গেছে।"

"ঝি, আমরাও তবে কেন একবার মাকে দেখে আসি চল না ?"

"তুমি যাবে ?"

"তা'তে দোষ কি ? আমি ত মাঝে মাঝে এমন গিয়ে থাকি।"

"কিন্তু, বা-বা বা—ড়ী—ই——"

"তা হোক। দেবতার স্থানে যাচ্ছি, এতে আর তিনি কিছু বল-বেন না।"

"তবে চল; আর দেরী ক'রে কাজ নেই,—অন্ধকার হ'য়ে এলো ব'লে।"

"তা চল না। আর, মার মন্দিরই বা কতদূর! এই দু'পা বৈত নয়।"

"একজন দরোয়ান সঙ্গে নেব?"

"কেন? মাকে দেখ্‌তে যাচ্ছি,—অত আড়ম্বর ক'রে যাবার দরকার কি?"

"তবু——"

দুলালী ঈষৎ হাসিয়া কহিল,—"কোন ভয় নাই।"

দাসী আর কোন কথা কহিল না। ইত্যবসরে সুকুমারী দুলালী, শয়নকক্ষে গমন করিয়া, একখানি মোটা চাদর গায়ে দিল। পরে উপর হইতে নীচে নামিয়া যেমন দ্বারদেশ অতিক্রম করিয়া যাইবে,—বালিকার গাত্রবস্ত্রখানি কে যেন টানিয়া ধরিল। দুলালী একটু চমকিয়া দাঁড়াইল। দাসী কহিল,—"দাঁড়ালে যে?"

"একটা বাধা প'ড়েছে;—কপাটে চাদরখানা আট্‌কে গিয়েছিল।"

দাসীর মনে কেমন-একটু খট্‌কা লাগিল। কহিল,—"তবে আজ আর গিয়ে কাজ নাই।"

বালিকা, উপেক্ষা করিয়া উড়াইয়া দিল,—"ও কিছু নয়,—চল যাই।" মনে মনে ভাবিল,—"দেবতার স্থানে যাইতেছি,—অমঙ্গল ভাবি কেন?"

উভয়ে আবার চলিতে আরম্ভ করিল। বহির্দ্বার অতিক্রম করিবে, এমন সময় একজন দ্বারবান, দাসীকে জিজ্ঞাসা করিল,—"মা জী, যান কোথায়?"

দাসী উত্তর করিল,—"মার মন্দিরে।" অতঃপর চলিতে চলিতে কহিল,—"আমরা, এই এলুম ব'লে।"

দরোয়ানজী তখন সিদ্ধি ঘুঁটিতেছিলেন। কথাটা বোধ হয় তাঁহার মনঃপূত হইল না;—তাই তিনি আপন মনে, দুই-চারিবার কি-একটু ইংরাজী আওড়াইলেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে দ্বিগুণবেগে, সিদ্ধির-কাটীটি সঞ্চালন করিলেন।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

দুলালী ও পরিচারিকা, যখন মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া পঁহুছিল, তখনও একবারে সন্ধ্যা হয় নাই,—মুখ দেখিয়া মানুষ চেনা যায়। এই সময়ে পার্শ্বস্থ গুল্মবন হইতে, একবারমাত্র অস্পষ্ট হুঙ্কারধ্বনি, তাহাদের কর্ণগোচর হইল। হিংস্র জন্তু ভাবিয়া, তাহারা একটু ত্বরিতপদে, সোপান অতিক্রম করিয়া মন্দিরে উঠিল।

মন্দিরের ভিতর তখন আলো দেওয়া হইয়াছে। সে উজ্জ্বল দীপালোকে, করাল কালীমূর্ত্তির শোভা আরও বৰ্দ্ধিত হইল। ভক্তিমতী দুলালী মায়ের সে মনোহর রূপ দেখিয়া, ক্ষণকালের জন্য, ইহসংসার ভুলিয়া গেল। বালিকার চক্ষু হইতে, দরবিগলিতধারে, প্রেমাশ্রু পড়িতে লাগিল। দুলালী, ক্ষণকালের জন্য, চিত্রার্পিতের ন্যায় এক দৃষ্টে, দেবীর মুখ-পানে চাহিয়া রহিল। পরিচারিকা, প্রণামাদি শেষ করিয়া, প্রভু-কন্যাকে চুপি চুপি কহিল,—"আর দেরি ক'র না,—মাকে নমস্কার ক'রে বাড়ী যাই চল!"

ভাবময়ী বালিকার কর্ণে, সে কথা স্থান পাইল না। পরিচারিকা আরও মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা করিল। বালিকা কিন্তু, সেই একভাবেই দেবীর মুখপানে চাহিয়া আছে,—তাহার চক্ষের পলক আর পড়ে না। এবার পরিচারিকা, দুলালীর অঙ্গ সঞ্চালন করিয়া কহিল,—"দিদি ঠাকরুণ, রাত হ'য়ে এলো যে, বাড়ী যাবে না?"

এবার বালিকার চমক ভাঙ্গিল। "এঁ্যা" বলিয়া, একবার মন্দিরের বাহিরে দৃষ্টিপাত করিল, দেখিল,—ঘোর অন্ধকার; মায়ের মুখের দিকে তাকাইল, দেখিল,—আরও অন্ধকার! সবিস্ময়ে আরও দেখিতে পাইল,—সেই করালবদনা কপালিনীর ত্রিনয়নে ত্রিধারা বহিতেছে!!!

"এ, কি দেখি, মা!" ভয়-ভক্তি-বিস্ময়সূচক স্বরে, বালিকার মুখ হইতে এই কয়েকটি কথা বাহির হইল। তাহার অন্তরাত্মা দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল।

পরিচারিকা, এবার একটু বিরক্তিভাবে কহিল,—"কি আর দেখ্‌বে?

যা সকলে দেখে, তাই দেখেছ। বলি, বাড়ী যেতে হ'বে, তা কি মনে নেই; নমস্কার ক'রে নাও না!"

দুলালী, একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া, গললগ্নীকৃতবাসে, ভক্তিভরে, সাষ্টাঙ্গে, দেবী-পদে প্রণাম করিল। অতঃপর উঠিয়া, কি মনে করিয়া কহিল,—"মাগো, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক!"

মন্দির হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলে, পরিচারিকা, আবার সেইরূপ বিরক্তি-ভাবে কহিল,—"দেখ দেখি, কি রকম অন্ধকার হ'য়েছে!"

বালিকা চমকিয়া দাঁড়াইল। পরিচারিকা, সেই সুরে কহিল,—"আবার কি হইল?"

অকস্মাৎ দুলালীর সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইল। ভয়ে তাহার অন্তরাত্মা কাঁপিতে লাগিল। পরিচারিকা, কোন উত্তর না পাইয়া একটু অধিক বিরক্তিভাবে কহিল,—"তোমার আসল মতলবটা কি, বল দেখি?"

বালিকার চক্ষে জল আসিল। পরিচারিকার স্কন্ধে মাথা রাখিয়া, রুদ্ধকণ্ঠে কহিল,—"ঝি, তুমি আমার উপর রাগ করিও না। দেখ, আজ মন্দিরে আসিয়া, আমি অনেক রকম আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিলাম। সে সব কথা কাহাকে বলিবার নয়। আর এমন যেন, কে আসিয়া আমার কাণে কাণে বলিয়া গেল,—'অভাগিনী, আজ, তুই কেন এ মন্দিরে, মরিতে আসিয়াছিলি? আজ তোর সর্ব্বনাশ হইবে,—প্রাণ যাইবে!' ঝি, আমার বুকের ভিতর কেমন করিতেছে,—ভয়ে পা সরিতেছে না!"

বলিতে বলিতে বালিকা, অস্ফুটস্বরে কাঁদিয়া ফেলিল। পরিচারিকাও একটু ভয়-ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল,—"আমি ত বাছা, তখনই তোমাকে, এখানে আস্‌তে বারণ ক'রেছিলেম। তুমিই শুন্‌লে না,—আমার কোন দোষ নেই।"

অতঃপর, কি ভাবিয়া একটু সাহসে ভর করিয়া কহিল,—"তা' এত ভয়ই বা কি? ঐ ত আমাদের বাড়ী দেখা যাচ্ছে,—এখান থেকে দু'পা বৈত নয়;—এইটুকু আর মার নাম ক'রে যেতে পারব না? তুমি আমার কাঁধ ধ'রে চল। ভয় কি?"

এই বলিয়া পরিচারিকা, সেই ভীতা, চম্পকলতাকে সযত্নে বক্ষে ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে লইয়া চলিল। যূপকাষ্ঠে নিপাতিত ছাগ-শিশুর

ন্যায়, বালিকা, ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। অতি কষ্টে মন্দিরের সোপা-নাবলী অতিক্রম করিয়া, তাহারা যেমন প্রাঙ্গণে পা দিবে,—হরি হরি হরি!!—কোথা হইতে বিকট দৈত্যাকার একটা পুরুষ আসিয়া, সবলে পরিচারিকাকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া, সেই স্বর্ণপ্রতিমা ছিনাইয়া লইয়া গেল এবং দেখিতে দেখিতে চক্ষের নিমেষে, কোথায় অদৃশ্য হইল!!

"ওগো, তোমরা এসগো!" বলিয়া পরিচারিকা উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অমনি "কি কি" শব্দে তিন চারিজন লোক, মন্দির হইতে অবতরণ করিল। পরিচারিকা কাঁদিতে কাঁদিতে সংক্ষেপে কোনও রকমে, এই দারুণ দুর্ঘটনার কথা জ্ঞাপন করিল।

তখন, সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে। অমাবস্যার অন্ধকার; ধরণী তখনই ঘোরা গভীরা মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। আকাশ,—পূর্ব্ব হইতেই একটু মেঘাচ্ছন্ন ছিল,—সময় বুঝিয়া অকস্মাৎ ঘোর-ঘনঘটা-সমাচ্ছন্ন, ভয়ঙ্কর বেশ ধারণ করিল। দিক্-দিগন্ত ব্যাপিয়া, বিজলী ছুটিতে লাগিল। জীব-জগৎ ভীত, চকিত, স্তম্ভিত করিয়া, ভৈরব-গর্জ্জনে বজ্রাঘাত হইতে লাগিল। মহা আঁধারে মিশিয়া, জল-স্থল-ব্যোম একাকার হইয়া উঠিল। বায়ুর বেগ অতি প্রবল হইল। ঝড়ের পূর্ব্ব-লক্ষণ দেখা দিল।

এই দারুণ দুর্য্যোগে, যে যাহার প্রাণ লইয়া শশব্যস্ত,—সুতরাং সে সোণার প্রতিমার সন্ধান লইবে কে? পরিচারিকাও অতি কষ্টে, মন্দিরে উঠিয়া, প্রাণ বাঁচাইল।

অল্পক্ষণের মধ্যে, প্রকৃতির এ বিকৃতিভাব অপসৃত হইল। বায়ুর গতি কমিল, আকাশও অপেক্ষাকৃত শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিল। কিন্তু অন্ধকার, সেই পূর্ব্বভাবেই রহিয়া গেল।

পরিচারিকা, অতি কষ্টে, কোনওরকমে বাটী পঁহুছিয়া সকলকে সংবাদ দিল,—সর্ব্বনাশ হইয়,—প্রভুর প্রাণাধিকা কন্যা, সোণার প্রতিমা, দস্যুকর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়াছে!!

অমনি "মার মার" শব্দে পাঁচ সাতজন লোক, সেই মন্দির-প্রাঙ্গণে আসিয়া উপস্থিত হইল। দেখিতে দেখিতে সে লতা-গুল্মবন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। প্রাণভয়ে হিংস্র জন্তুগণ কোথায় অন্তর্হিত হইল। কিন্তু তথাপি, সে স্বর্গভ্রষ্টা বালিকা মিলিল না। অতঃপর মশাল

জ্বালিয়া, সকলে মিলিয়া, বন পাতি পাতি করিয়া খুঁজিল,—বাগান-বাগিচা, খাল-বিল, কুটীর বন,—একে একে সকল দেখিল,—কিন্তু হায়, সে হারানিধি আর মিলিল না,—মিলিবেও না!!

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে, ত্রিবক্র ও নরেন্দ্র,—দুই মহাপাপী, উৎসুক-চিত্তে, অপেক্ষা করিতেছে,—কতক্ষণে তাহাদের পাপ-বৃত্তি চরিতার্থ হইবে। পাপিষ্ঠ-দ্বয়ের বৃত্তি স্বতন্ত্র প্রকার। ত্রিবক্র—হিংসা, নরেন্দ্র—কাম। এ দুয়ের সংমিশ্রণে, দুয়েরই মনের গতি, এক পথে ছুটিতেছে। কে কম, কে বেশী, পাঠক তাহার বিচার করুন।

ত্রিবক্র কিছুক্ষণ, আপন মনে কি ভাবিয়া, উন্মত্তভাবে কহিল,—"ধর্ম্ম কি নাই?"

নরেন্দ্রও এই সময় আপন মনে কি চিন্তা করিতেছিল; হঠাৎ গর্জ্জিয়া উঠিয়া কহিল,—"অবশ্যই আছে। দেখ্ পিশাচ!—হাতে-হাতে তার ফল দেখ্! আপনি মজিলি, আমায়ও মজালি!"

ত্রিবক্রের চৈতন্য হইল; হাসিয়া কহিল,—"ও কি 'প্রলাপ' বকিতে-ছেন?"

নরেন্দ্রও প্রকৃতিস্থ হইল; চমক ভাঙ্গিয়া কহিল,—"কৈ, না! ত্রিবক্র, তুমি ইতিপূর্ব্বে আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিতেছিলে?

"আমি? কৈ, না;—কিছু না!"

"আমার যেন বোধ হইল, তুমি আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিলে, আমি তাহার উত্তর দিলাম।"

"আমিও ত তাই ভাবিতেছি,—কাহাকে হাতে-হাতে ফল দেখাই-তেছেন!"

"তবে ও কিছু নয়,—নেশার ঝোঁকে কি বলিয়া ফেলিয়াছি।"

"কৈ, আমার ত এক বিন্দুও নেশা হয় নাই।"

"না হয় আবার 'পালা' আরম্ভ করি এস!"

"অমৃতে অরুচি কার?"

আবার সেই পাপ-স্রোত চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দুই তিনটা বোতল শূন্য হইয়া পড়িল। নরেন্দ্র, ঘোরতর মাতাল হইল,— জ্ঞান হারাইল; ত্রিবক্রের চৈতন্য লোপ পাইল না। মাদকে তাহার মত্ততা আনাইতে পারে না। পাপিষ্ঠ এখনও পাপ-চিন্তায় রত,—"আর কিরূপে নরেন্দ্রের সর্ব্বনাশ হয়? জ্ঞাতি, বন্ধু, প্রতিবাসী, প্রজা হইতে আরম্ভ করিয়া, গুরু-কন্যা পর্য্যন্ত উঠাইয়াছি;—পৃথিবীতে আর নূতন নরক কি সৃষ্টি হইতে পারে!"

একটু ভাবিয়া, আবার মনে মনে কহিল,—"আচ্ছা, আজ ত মাধব ঘোষের মুখে চুণ-কালী দিই, তারপর এ বাসন্তীপুরে যে কয়জন বাকী আছে,—সকলের মুখ ভোঁতা ক'রে নূতন নরকের সৃষ্টি করিব! কুঁজো বলিয়া, গরীব বলিয়া, পাপী বলিয়া, লোকে একদিন আমার প্রাণে কি, কম দাগাটা দিয়াছে! সে দুঃখ কি, আমি মরিলেও ভুলিব! যখন নরেন্দ্রকে হাতে পাইয়াছি, তখন একে একে আমার সকল মনের সাধ মিটাইব!"

এইরূপ পাপ-চিন্তায় রত আছে, হঠাৎ পাপিষ্ঠের হৃৎপিণ্ডে কে যেন দারুণ আঘাত করিল। অমনি বিকট-কণ্ঠে চীৎকার করিয়া কহিয়া উঠিল,—"না—না, ইহা কি সম্ভব?"

অতঃপর জনৈক দ্বারবান্‌কে কহিল,—"ওরে শীঘ্র গাড়ী জুড়িতে বল্, আমি বাড়ী যাইব"

পিশাচ নরেন্দ্র বিকৃতকণ্ঠে কহিল,—"ত্রিবক্র, তুমি আমায় একা ফেলিয়া চলিয়া যাইবে? আমি যে, আর বাঁচি না ভাই!"

এই বলিয়া কামোন্মত্ত পিশাচ গর্জ্জিয়া উঠিল।

ত্রিবক্র কহিল,—"হুজুর, হঠাৎ আমার মন বড় খারাপ হইয়া উঠিয়াছে,—মাপ করিবেন,—আমি চলিলাম।"

অতঃপর, আকাশের দিকে চাহিয়া কহিল,—"উঃ, যে মেঘ করিয়াছে, এখনই ঝড়-বৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা। আমাকে বাড়ী যাইতেই হইবে,—এই সুযোগে যাই।"

নরেন্দ্র, আবার উন্মত্তভাবে কহিল,—"বন্ধু, তবে আমার দশা কি হইবে? বিরাজমোহিনীকে,—"

"সে জন্য ভাবিবেন না। আমার লোক, কখন শিকার হারাইবে না। যেমন করিয়াই হৌক, তাহাকে আনিল বলিয়া। তবে এই দুর্য্যোগে কি হইয়াছে, বলিতে পারি না। বিশেষ নৌকার-পথে আনা!"

নরেন্দ্র, ত্রিবক্রের পায়ে ধরিল। কহিল,—"যে পর্য্যন্ত না তারা আসিয়া উপস্থিত হয়, সে পর্য্যন্ত তুমি থাক।"

ত্রিবক্র, অগত্যা স্বীকৃত হইল। কিন্তু তাহার মন আর কিছুতেই সুস্থ হইতেছে না,—যেন বুকের উপর কে চাপ দিয়া, হৃদয়ের অস্থিপঞ্জর সব ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিল। হতভাগ্য, উন্মত্তের ন্যায়, একবার উপর—একবার নিম্নে আসিয়া, অনুচরগণের আশা-পথ অপেক্ষা করিতে লাগিল।

এমন সময়, একজন লোক হাঁফাইতে হাঁফাইতে, তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। ত্রিবক্র উদ্‌গ্রীবভাবে কহিল,—"কি রে দীনে! খবর কি? কাজ 'ফতে' ক'রেছিস ত?"

অনুচর হাঁপাইতে হাঁপাইতে কহিল,—"আজ্ঞে হাঁ।"

এই বলিতে বলিতে আট দশজন যমাকৃতি পুরুষ, একটি কনক-পদ্মকে বস্ত্রাবৃত করিয়া, শবদেহের ন্যায় স্কন্ধে করিয়া, তথায় উপস্থিত হইল। ত্রিবক্রের হৃৎতন্ত্রে, আবার কে, মর্ম্মান্তিক আঘাত করিল। হতভাগ্য উন্মত্তভাবে উপরে উঠিয়া নরেন্দ্রকে কহিল,—"মহারাজ! আপনি মনের সুখে, ভোগলিপ্সা চরিতার্থ করুন; আমি চলিলাম।"

নরেন্দ্র, বিকট উল্লাসে কহিল,—"এ পদ্মিনীকে একবার তুমি দেখিয়া যাইবে না?"

"হুজুর, আপনার সুখেই আমার সুখ;—আজ আমি আর অপেক্ষা করিতে পারিলাম না।"

এই বলিয়া হতভাগ্য, তথা হইতে বিদ্যুদ্বেগে প্রস্থান করিল। দীনু নামে, সেই প্রথম অনুচর, ঊর্দ্ধশ্বাসে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতে দৌড়াইতে কহিল,—"একটা কথা বলিবার আছে,—শুনিয়া যান।"

"আজ থাক্,—কাল শুনিব।"

এই বলিয়া ত্বরিতপদে ত্রিবক্র গাড়ীতে উঠিল। গাড়ীও অতি দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। এদিকে ধর্ম্মের কলও বাতাসে নড়িল।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

পথের মধ্যস্থানে আসিয়া, গাড়ীর চাকা ভাঙ্গিয়া গেল। ত্রিবক্র গাড়ী হইতে লম্ফ দিয়া, উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিল। হতভাগ্য যতই বাড়ীর দিকে অগ্রসর হয়, ততই তাহার মর্ম্মস্থল ভেদ হইতে থাকে। এই সময়ে, মুষলধারে বৃষ্টি আসিল। তৎসঙ্গে প্রবল বাতাসও বহিতে লাগিল। ঘন ঘন বজ্রাঘাতে দিক্-দিগন্ত কাঁপিয়া উঠিল। একে ভীমা অমাবস্যা-রজনীর ভয়ঙ্কর অন্ধকার; তদুপরি প্রবল ঝড় বৃষ্টি-বজ্রাঘাত! যেন ধরা-বক্ষে পিশাচ-যুদ্ধ হইতে লাগিল।

সেই গভীর দুর্য্যোগে, ঝড়-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝাবাত মাথায় করিয়া, হতভাগ্য, উন্মত্তবেশে, উদ্যান-বাটীতে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া, দ্বার-রক্ষিগণ চমকিত হইল। ত্রিবক্র, কম্পিত কণ্ঠে, ভগ্নস্বরে কহিল,—"সংবাদ কি? আমার দুলাল্ কোথায়?—মা-আমার কেমন আছে?"

রক্ষিগণ, অধোবদনে ম্রিয়মাণ রহিল।

"এঁ্যা!—" বলিয়া, ত্রিবক্র বিহ্বল হইয়া পড়িল। অতঃপর ক্রোধ কষায়িতনেত্রে বজ্রগম্ভীর স্বরে কহিল,—"বল্, শীঘ্র বল্,—কি হইয়াছে?—মা-আমার কোথায়?—ওরে বল্,—নহিলে এখনই সকলের মুণ্ড-পাত করিব।"

অগত্যা একজন দ্বারবান, ভয়বিহ্বলকণ্ঠে, সংক্ষেপে, কোনওরকমে অশুভ সংবাদ জ্ঞাপন করিল।

"এঁ্যা" বলিয়া, ত্রিবক্র বসিয়া পড়িল। হতভাগ্যের মাথায় যেন বাজ্ পড়িল। এককালে যেন শত সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করিল। হৃৎপিণ্ড যেন ছিঁড়িয়া গেল। মর্ম্মান্তিক যাতনায়, বিকল কণ্ঠে কাহয়া উঠিল,—"এঁ্যা! এঁ্যা!! মা-আমার নাই! মা, দুলাল্ রে!—"

হতভাগ্য শিরে করাঘাত করিয়া ভূমিসাৎ হইল। তখনই আবার বিদ্যুদ্বেগে উঠিয়া উদ্‌ভ্রান্তভাবে, প্রাণাধিকা কন্যার শয়নগৃহে গমন করিল। দেখিল, দীপাধারে দীপ জ্বলিতেছে, কিন্তু তাহা আভাহীন! দুলালী বিহনে দীপালোকও বুঝি আজ মলিন হইয়াছে! দুলালের স্মৃতি সব আছে,—সেই ভাগবত, সেই ভারত, সেই রামায়ণ, সেই বেশ, সেই ভূষা—সব আছে,—নাই কেবল প্রাণের দুহিতা দুলাল্;—নাই

কেবল তাহার জীবনসর্ব্বস্ব তনয়া!! গৃহ শূন্য, শয্যা শূন্য। হায়, দুলালী তথায় নাই! সেই সরলা, স্নেহময়ী, ধর্ম্মব্রতা, জীবনসর্ব্বস্ব দুহিতা তথায় নাই! তাহার সংসারের একমাত্র বন্ধন, অশান্তি-সাগরের ধ্রুব-তারা, ভালবাসার মূর্ত্তিমতী প্রতিমা, সে নিজের দোষে, দুর্ম্মতিবশে নষ্ট করিয়াছে!

মুহূর্ত্ত মধ্যে, পাপিষ্ঠের অনেক দিনের অনেক কথা মনে পড়িল।—পতিপ্রাণা, লক্ষ্মীস্বরূপিণী কমলার কথা,—"স্বামিন্, তুমি ধর্ম্মে মতি না দিলে, বিধাতা বুঝি, দুলালের ধর্ম্ম রক্ষা করিবেন না!" সতীর সেই ভবিষ্যদ্বাণী মনে পড়িল। মর্ম্মাহত-পিতা রুদ্রনারায়ণের মর্ম্মান্তিক অভিসম্পাত মনে হইল,—"অচিরে যেন আমার-মত দশা তোর হয়!—আশীর্ব্বাদ করি, সে অবধি তুই বাঁচিয়া থাকিবি!" পঞ্চাননের সেই মর্ম্মভেদী কঠোরোক্তি মনে পড়িল,—"ত্রিবক্র ধর্ম্ম কি নাই; একদিন তোকে ইহার প্রতিফল ভোগ করিতেই হইবে!" এইরূপে, একে একে সকল স্মৃতি, তাহার অন্তরে জাগরূক হইতে লাগিল। তাহাতে হতভাগ্য, আরও অধীর হইয়া উঠিল। যেন সংঘাতিক কাটা ঘায়ে নুণের ছিটা পড়িতে লাগিল। হৃদয়ের পরতে-পরতে, যেন সহস্র সহস্র বৃশ্চিকে দংশন করিতে লাগিল। আর স্থির থাকিতে না পারিয়া, হতভাগ্য উন্মত্তভাবে, বিকলকণ্ঠে, কহিয়া উঠিল,—"হায়, হাতে করিয়া, আমার নিজের সর্ব্বনাশ আমি নিজে করিলাম। রুদ্রনারায়ণ, তুমি ত আমা হইতে লক্ষগুণে সুখী,—তোমার অজ্ঞাতে, পিশাচে তোমার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল; আর আমি যে———"

বলিতে বলিতে কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল,—হতভাগ্য প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতেও পারিতেছে না। অনুতাপ, আত্মগ্লানি, অপরিণামদর্শিতা, দুর্ব্বুদ্ধি—সকল স্মৃতি মনে উদয় হওয়ায়, হতভাগ্য দারুণ যন্ত্রণায়, কাটা-ছাগলের ন্যায় ছট্‌-ফট্‌ করিতে লাগিল। অতঃপর কি ভাবিয়া গর্জ্জিয়া উঠিল। উন্মত্তভাবে কহিল,—"না—না, এখন বিলাপের সময় নয়! নরেন্দ্র এখনও জীবিত আছে,—পিশাচ এখনও ভোগ-লিপ্সায় রত আছে;—অগ্রে তাহার জীবনসংহার করি! সেই পাপিষ্ঠ হইতে, মার-আমার———

মুখে সকল কথা ফুটিল না। ক্রোধে দুঃখে, অভিমানে মনস্তাপে, নিদারুণ যন্ত্রণায় হতভাগের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িবার উপক্রম হইতে লাগিল।

তখনও ভীমবেগে ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাত হইতেছে। তাহাতে দৃক্‌পাত না করিয়া, ত্রিবক্র, বিদ্যুদ্বেগে নিম্নে আসিল। দুলালীর সহচারিণী সেই পরিচারিকা, প্রভুর সে উন্মত্ত-বেশ দেখিয়া, আতঙ্কে কাঁদিয়া উঠিল। বিকলকণ্ঠে ত্রিবক্র কহিল,—"ভয় নাই,—তোকে কিছু বলিব না! যার জন্য আমার এই দশা, দেখ্, স্বহস্তে এখনই তার কি দশা করিয়া আসি!"

হতভাগ্য, উদ্‌ভ্রান্তবেশে, রক্ষিগণের গৃহে প্রবেশ করিল। প্রাচীর-লম্বিত একখানি তীক্ষ্ণধার ঝল-মল করিতেছিল; ক্ষিপ্রহস্তে সেইখানি লইয়া, বিদ্যুদ্বেগে তথা হইতে বহির্গত হইল! প্রহরিগণ স্তম্ভিতভাবে নির্ব্বাক হইয়া রহিল;—প্রভুর সেই রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া, কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

হতভাগ্য ত্রিবক্র, বৈরনির্যাতন-স্পৃহায় উন্মত্ত হইয়া, সেই ঝড়-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝাবাত মাথায় করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল। বাহিরে,—সেই অমাবস্যার ভয়ঙ্কর অন্ধকার,—তদুপরি ঝড়-বৃষ্টি-বজ্রাঘাত;—আর ত্রিবক্রের অন্তরেও এইরূপ মহাপ্রলয়! দুই সুর ঠিক মিলিল!

সেই গভীর দুর্য্যোগে, মহাসমস্যাপূর্ণ সময়ে, ঝড়-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝাবাত মাথায় করিয়া, রুদ্রমূর্ত্তিতে ত্রিবক্র দৌড়িতে লাগিল। বাঁধা-পথ দিয়া যাইলে, অধিক সময় লাগিবে,—এজন্য ত্রিবক্র, সেই দুর্গম প্রান্তর ভেদ করিয়া চলিতে লাগিল। কণ্টক-আবর্জ্জনায় পাদদেশ ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল, তাহাতে ভ্রূক্ষেপও করিল না! দেখিতে দেখিতে, গন্তব্যস্থানে উপনীত হইল।

হতভাগ্য যখন নরেন্দ্রের বাটীর সম্মুখবর্ত্তী হইল, তখন একবার ভৈরব গর্জ্জনে, বজ্রপাত হইল। জল-স্থল-ব্যোম, সে মহারাবে কাঁপিয়া উঠিল। ত্রিবক্রের দুর্দ্দমনীয় প্রতিহিংসা-বৃত্তিও ক্ষণকালের জন্য লোপ

পাইল। তাহার হৃদয়, আর একবারের জন্য কাঁপিয়া উঠিল;—এক-বারের জন্য কাঁদিয়াও উঠিল।

ত্রিবক্র দেখিল, দ্বার রুদ্ধ। অমনি উপর্য্যুপরি, তাহাতে মর্ম্মান্তিক পদাঘাত করিতে লাগিল। লৌহ-কবাট ঝন্ ঝন্ রবে বাজিয়া উঠিল। একজন দ্বারবান কহিল,—"কোন্ হ্যায়?"

উত্তর নাই। আবার সেই বজ্রগম্ভীর ধ্বনি!—আবার সেই অবি-শ্রান্ত ঝম্ ঝম্ রব। দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। এই সময় একবার বিদ্যুৎ চমকিল। দ্বারবান, বিস্মিত নেত্রে দেখিল,—সংহারবেশে ত্রিবক্র! ত্রিবক্রের সে ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া, তাহার বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইল না। সেই বৈদ্যুতালোকে, প্রাসাদের উপর হইতে, সভয়ে, কম্পিত-হৃদয়ে দেখিল, আর একজন,—সে, নরেন্দ্র।

নরেন্দ্র, চক্ষের নিমিষে সকলই বুঝিল। যখন কামোন্মত্ত পিশাচ, সেই ভীতা, লজ্জাবতীলতা, প্রেম-প্রতিমা, সুকুমারী দুলালীর ধর্ম্মনষ্ট করে,—তখন বালিকা, শেষ-রক্ষার আশায়, আপন পরিচয় দিয়াছিল; দেবতার চরণে অনেক কাঁদিয়া-কাটিয়া ছিল;—কিন্তু হায়, সে জানিত না যে, তাহার অলক্ষ্যে, অদৃষ্ট, নিষ্ঠুর-হাসি হাসিয়াছিল!

পিশাচ নরেন্দ্র, নানাবিধ পৈশাচিক-উপায়ে, পশু-বৃত্তি চরিতার্থ করিলে, বালিকা মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িল। সেই কমনীয়া ফুল-বালাকে সেই অবস্থায় রাখিয়া, পাপিষ্ঠ মুহুর্ম্মুহু গবাক্ষদ্বারে দৃষ্টি রাখিতেছিল,—তাহার জীবনহন্তা আসিয়া উপস্থিত হয় কি না! পাপিষ্ঠ, যাই বৈদ্যুতা-লোকে ত্রিবক্রকে দেখিল, অমনি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া, চারিদিকে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল! আর কোনদিকে পলাইবার পথ না পাইয়া ছাদে গিয়া উঠিল! গবাক্ষ-দ্বারটি পূর্ব্ববৎ উন্মুক্ত রহিয়া গেল।

তখনও প্রকৃতির সেই দারুণ দৃশ্য! হতভাগ্য নরেন্দ্র, ছাদে উঠিয়া, প্রজ্বলিত-গৃহে-আবদ্ধা-গাভীর ন্যায় ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। উপরে আকাশের সাংঘাতিক বজ্র, নিম্নে ত্রিবক্রের শাণিত কৃপাণ! এমন সময়, সেই ভীষণ ঝড়-বৃষ্টি-ঝঞ্ঝাবাতকে দ্বিগুণতর ভীষণ করিয়া, দিক্-দিগন্তে চপলা চমকিয়া উঠিল। সে তীব্রালোক নরেন্দ্রের চক্ষে অসহ্য বোধ হইল,—ত্বরিতপদে, হতভাগ্য, তথা হইতে যেমন অন্তর্হিত হইবে,—

হরি হরি হরি!!! দিক্-দিগন্ত কাঁপাইয়া, জল-স্থল-ব্যোম প্রতিধ্বনিত করিয়া, সেই মহা বাজ্ নরেন্দ্রের মস্তকে পতিত হইল!! ব্রাহ্মণের অমোঘ অভিসম্পাত ব্যর্থ হইবার নহে,—হতভাগা, তাহাতেই জাব-লীলা শেষ করিল!!!

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

এদিকে ত্রিবক্র, ত্বরিতপদে, সেই উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে, নরেন্দ্রের বিলাস-মণ্ডপে,—যেখানে বসিয়া, পাপিষ্ঠ অহর্নিশি নূতন নূতন নরকের সৃষ্টি করিত,—সেই মহা পাপ-স্থানে, চণ্ডালবেশে উপস্থিত হইল! দেখিল, গৃহ অন্ধকার! সেই অন্ধকারে, লক্ষ্য করিয়া, উদ্‌ভ্রান্তভাবে, বিকলকণ্ঠে ডাকিল,—"নরেন্দ্রনারায়ণ,——"

সে স্বর, কক্ষে কক্ষে প্রতিধ্বনিত হইল। নৈশপ্রকৃতির মহাপ্রলয়ে তাহা মিশিয়া গিয়া হো-হো অট্টহাস করিতে লাগিল! পাপিষ্ঠ, কোন উত্তর পাইল না। আবার ডাকিল,—"নরেন্দ্রনারায়ণ! পিশাচ! তোর জন্য আমার সর্ব্বনাশ হইল! এখন আয়, তোর রক্তে, আমার হৃদয় শীতল করি!"

অন্যমনে, অতি কষ্টে কহিল,—"মা, দুলাল্ রে!"

কিন্তু এবারও কোন উত্তর নাই। ত্রিবক্র গর্জ্জিয়া উঠিল। আরও ক্রোধকম্পিতস্বরে কহিল,—"বটে! এখনও প্রাণের মমতা!——"

এই সময়ে সেই বিস্তৃত কক্ষের এক কোণে, একখানা বড় কাগজ বায়ুভরে খস্ খস্ শব্দ করিতে লাগিল। ঠিক যেন কাহার সতর্কসূচক পদধ্বনি হইতে লাগিল। কিন্তু ত্রিবক্র বুঝিল, তাহার আততায়ী নরেন্দ্র লুক্কায়িত হইতেছে! অমনি অট্টহাস্যে কহিল,—"হাঃ—হাঃ—হাঃ! লুকাইবি কোথায়? এই দেখ্, তোর কি দশা করি!"

এই বলিয়া, সেই উন্মুক্ত শাণিত কৃপাণ উত্থিত করিয়া, ঠিক সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া চলিল। ঠিক সেই লক্ষ্য স্থানে, আবার ঠিক যেন সেইরূপ

সতর্কসূচক পদধ্বনিও হইল,—সেই কাগজখানা, একটি মূর্চ্ছিতা বালিকার অঙ্গে বাধা পাইয়া স্থির হইল! অমনি, ঠিক সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া, নরহন্তা নারকী, নরকাগ্নি প্রজ্বলিত করিল;—সেই শাণিত-কৃপাণ, বজ্র-বেগে, আততায়ীর শিরশ্ছেদ করিল!!! অ-হ-হ! নিষ্ঠুর ভবিতব্য!!

রক্ত-গঙ্গা বহিতে লাগিল! অন্ধকারে কিছুই দেখিবার উপায় নাই। কিন্তু নরহন্তা বুঝিল,—তাহার লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই,—উত্তপ্ত-শোণিত-স্রোতে তাহার পাদদেশ সিক্ত হইয়াছে!!

মহানন্দে পিশাচ অট্টহাস করিতে লাগিল। সেই সদ্যোরক্ত সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া, উৎকট-বিকট-বীভৎসভাবে কহিতে লাগিল,—"রুদ্রনারায়ণ, তোমার অভিসম্পাত ফলিয়াছে বটে;—কিন্তু একবার আসিয়া দেখিয়া যাও,—বীরের মত, হাতে হাতে, কিরূপ প্রতিহিংসা লইলাম!"

অতঃপর মর্ম্মভেদী কাতর-কণ্ঠে, অস্পষ্টভাবে কহিল,—"মা দুলাল্ রে! যে পিশাচের হস্তে তোর ধর্ম্মনষ্ট হইয়াছে, দেখ্ মা, তার কি দশা করিলাম! আমার কাছে আয় না মা! লজ্জা কি! ভয় নাই, তোকে কিছু বলিব না! মা-আমার! কথা কহিতেছ না কেন?—পাপিষ্ঠ পিতার উপর কি রাগ করিয়াছ?"

কৈ, কোন উত্তর নাই যে!

পাপিষ্ঠ, কি ভাবিয়া, অন্ধকারে, আততায়ীর ছিন্ন-মুণ্ড অন্বেষণ করিতে লাগিল। ছিন্ন-মুণ্ড মিলিলও বটে;—কিন্তু একি! এঁ্যা! এ, কাহার মস্তক? নরেন্দ্রের মাথায় কি এত চুল ছিল? কৈ,—না!

এইবার পাপিষ্ঠ আপন হাত আপনি দংশন করিতে লাগিল; অধরোষ্ঠ ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিল। গলদেশ চাপিয়া ধরিয়া জিহ্বা টানিয়া বাহির করিবার চেষ্টা পাইল। ভীত, চকিত, স্তম্ভিত, বিস্মিত, মোহিতভাবে, হতভাগ্য ছিন্নমুণ্ড কোলে লইয়া গবাক্ষদ্বারে চাহিয়া রহিল! অন্ধকারে চক্ষু ফাটিয়া আগুন জ্বলিতে লাগিল! একবার মাত্র পরীক্ষা সাপেক্ষ! অমনি দিক্-দিগন্ত চমকিত করিয়া, অট্টহাস্যে বিজলীর বিকাশ হইল!—হরি হরি হরি!!—ত্রিবক্র! একি!—এ কি দেখিলে?—এ যে তোমার হেম-লতা দুলালীর ছিন্ন মুণ্ড!!

নাদস্বরে, স্তম্ভিতভাবে, পাপিষ্ঠ ডাকিল,—"দু—লা—ল্!——"

হরি হরি হরি!! সে স্বর আর মুখ ফুটিয়া বাহির হইতে পারিল না,—একটা বিকট দীর্ঘশ্বাসে লয় পাইল!!

চক্ষের নিমিষে, পাপিষ্ঠ সকলই বুঝিল। অধর্ম্মের উপর ধর্ম্মের অভিসম্পাতের লীলা-খেলা কিরূপ ভয়ঙ্কর, তাহার চূড়ান্ত প্রমাণ আপনা হইতেই পাইল। বুঝিল যে, "রুদ্রনারায়ণের অভিসম্পাত হাতে-হাতে ফলিয়াছে!!"

ত্রিবক্র, "হতভাগ্য নরেন্দ্রকে পাপে শিক্ষিত করিয়াছিল, কন্যাকে পবিত্রতায় দীক্ষিত করিয়াছিল;—কিন্তু প্রকৃতির এমনই প্রতিবিধান যে, সেই অধর্ম্ম-দীক্ষিত নরেন্দ্র হইতেই, সেই ধর্ম্মদীক্ষিতা কন্যার ধর্ম্মনষ্ট হইল। যে পাপিষ্ঠ একদিন, মর্ম্মাহত-পিতার কাতর কণ্ঠস্বর শুনিয়া উপহাস করিয়াছিল,—দেখ দেখ! সেই আজ ততোধিক মর্ম্মাহত হইয়া, স্বহস্তে সংসার-বন্ধনের একমাত্র সূত্র ছিন্ন করিয়া, কন্যার ছিন্ন-মুণ্ড ক্রোড়ে করিয়া বসিয়া আছে। পাপিষ্ঠ কাঁদিতেও পারিল না!"

কাঁদিবে কিরূপে? যে দিক্ দিয়া যেমন ভাবে দেখে, সকলই তাহার নষ্টবুদ্ধির ফল! ইহারই নাম প্রকৃতির প্রতিশোধ!! ইহাকে বিধির-বিধান বলিতে ইচ্ছা হয় বল,—প্রকৃতির প্রতিবিধানও বলিতে পার!

পাপিষ্ঠ, আত্মহত্যা করিতে, শাণিত-কৃপাণ উত্থিত করিল; কিন্তু হাত হইতে তাহা খসিয়া পড়িল। শূন্যে আর একখানি কোষমুক্ত কৃপাণ দেখিল;—যেমন তাহা ধরিতে গেল, জড়-অসি অট্টহাস্যে হুঙ্কার করিতে করিতে কোথায় অন্তর্হিত হইল!!

আবার সেই মৃত-কন্যার চাঁদমুখ দেখিতে ইচ্ছা হইল। যাহাকে প্রাণান্তপণে ভালবাসিয়া, জীবনের যথাসর্ব্বস্ব দিয়াও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই, বিধির বিধানে, আজ তাহাকে স্বহস্তে বধ করিয়া, তাহার সেই ধূল্যবলুণ্ঠিত ম্লান-মুখখানি দেখিতে হতভাগ্যের অতৃপ্ত-ইচ্ছা হইতেছে! পাপিষ্ঠ আর একবার কাঁদিতে চেষ্টা করিল। আবার সেই অতি অস্পষ্ট নাদস্বরে, মর্ম্মস্থল ভেদ করিয়া, হতভাগ্য অতি কষ্টে কহিল,—"মা,—দু—লা—ল্!"

পাপিষ্ঠ এবারও কাঁদিতে পারিল না। এইবার সেই বিস্তৃত কক্ষে, বীভৎসবেশে ছুটিয়া বেড়াইতে লাগিল। দেওয়ালে মাথা খুঁড়িয়া ক্ষত

বিক্ষত করিয়া ফেলিল। হস্তে ও অধরোষ্ঠে দংশন করিয়া রক্তপাত করিল,—একবার যদি, কোনও-মতে ডাক্ ছাড়িয়া, প্রাণ খুলিয়া, একটুও কাঁদিতে পারে!!

হতভাগ্য আবার উপবেশন করিল; মৃত-কন্যাকে কোলে লইল; কাটা-ধড়টা ও মুণ্ডটা এক করিল; সকল স্মৃতি এককালে জাগাইল; সবটা মন-প্রাণ এক করিয়া কাঁদিতে চেষ্টা করিল;—হরি হরি হরি!!! এবারও অতি কষ্টে, সেই নাভিকুণ্ডোত্থিত নাদস্বরে গুটি-দুই-মাত্র কথা, অতি অস্পষ্টভাবে, বিকট নিশ্বাসের সহিত মুখ হইতে বাহির হইল,—

"মা,—দু—লা—ল্।"

না,—আর না।

* * * * * *

সমাপ্ত।

বাল্মীকি-রামায়ণ।

বৰ্দ্ধমান-রাজবাটীর বঙ্গানুবাদ। ৩৪ খানি ছবি আছে। অন্য রামায়ণে নাই, এমন অনেক নূতন কথা ইহাতে আছে। প্রত্যেক মূলশ্লোকের সহিত এই অনুবাদের মিল আছে। মূল্য ১৷৵০ এক টাকা ছয় আনা, ডাঃ মাঃ ।৵০ ছয় আনা। বৃহৎ সপ্তকাণ্ড সম্পূর্ণ।

অধ্যাত্ম রামায়ণ।

বেদব্যাসপ্রণীত। মূল্য দশ আনা; ডাঃ মাঃ ৵০ তিন আনা। মূল এবং বঙ্গানুবাদ সম্পূর্ণ।

কালিকা পুরাণ।

এই একখানি শ্রেষ্ঠ উপপুরাণ। বঙ্গানুবাদ। নানা রস-রহস্য ইতিহাস, ইতিবৃত্ত, ধৰ্ম্মতত্ত্ব, ব্রতানুষ্ঠানাদি বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ৷৹ আট আনা। ডাঃ মাঃ ৵০ দুই আনা।

সচিত্র সুলভ মহাভারত।

(অথচ অক্ষর ছোট নয়, এবং কাগজ ভাল)

(কিন্তু বিলাতী বাঁধান নয়—টীশ বাঁধাই)

অষ্টাদশপৰ্ব্ব সম্পূর্ণ। বেদব্যাসপ্রণীত। বৰ্দ্ধমান-রাজবাটীর গদ্য-বঙ্গানুবাদ। প্রায় দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে, বহুপণ্ডিতের সাহায্যে, ২৬ বৎসরের যত্নে ও পরিশ্রমে এই মহাভারতের বঙ্গানুবাদ কার্য্য সম্পূর্ণ

হইয়াছে। অধুনা এদেশে মহাভারতের যত রকম বঙ্গানুবাদ প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে বর্দ্ধমান-রাজবাটীর মহাভারতই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। অন্য মহাভারতে পাওয়া যায় না, এমন অনেক নূতন কথা ইহাতে আছে। প্রত্যেক মূল শ্লোকের সহিত মিল রাখিয়া ইহার বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন হইয়াছে। মহাভারতপাঠের প্রকৃত ফল—এই বিশুদ্ধ মহাভারত পাঠেই পাওয়া যায়। তিপ্পান্নখানি উৎকৃষ্ট ছবি আছে।

সচিত্র হরিবংশ।

বেদব্যাস প্রণীত। বর্দ্ধমান-রাজবাটীর গদ্য-বঙ্গানুবাদ। হরিবংশ, মহাভারতের পরিশিষ্ট ভাগ। হরিবংশ ব্যতীত মহাভারত সম্পূর্ণ নহে। হরিবংশে সাতখানি ছবি আছে।

মহাভারতের মূল্যাদি।

এই মহাভারতের সুলভ মূল্য ৪৷৹ চারিটাকা চারি আনা। ডাকমাসুল ৸৵৹ পনের আনা। হরিবংশের সুলভ মূল্য একটাকা, ডাঃ মাঃ ৷৹ চার আনা। দুইখানি গ্রন্থের মোট মূল্য ৫৷৹ পাঁচ টাকা চারি আনা। ডাকমাসুল অবশ্যই স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

বঙ্গানুবাদ

শ্রীমদ্ভাগবত

এবং মূল ও বঙ্গানুবাদ

মনুসংহিতা।

সর্ব্বসাধারণকে একণে ২৷৹ দুই টাকা চারি আনা মূল্যেই উক্ত উভয় গ্রন্থ প্রদত্ত হইতেছে। কেহ একত্র এক নামে চারিশেট গ্রন্থ লইলে, এক শেট উপহারস্বরূপ পাইবেন। বলা বাহুল্য, ইহা ব্যতীত ডাকমাশুল প্রত্যেক শেটে সাত আনা হিসাবে দিতে হইবে।

যিনি কেবল শ্রীমদ্ভাগবত লইবেন, তিনি এক টাকা বার আনাতেই

পাইবেন। ডাঃ মাঃ পাঁচ আনা লাগিবে। একত্র চারিখানি শ্রীমদ্ভাগবত লইলে, একখানি শ্রীমদ্ভাগবত উপহারস্বরূপ পাইবেন। যিনি কেবল মূল অনুবাদ মনুসংহিতা লইবেন, তিনি দশ আনা মূল্যেই পাইবেন। একত্র চারিখানি মনুসংহিতা লইলে, একখানি মনুসংহিতা উপহার পাইবেন। মফস্বলের গ্রাহকগণকে ডাঃ মাঃ স্বতন্ত্র দিতে হইবে।

মডেল-ভগিনী।

নূতন অনুষ্ঠান—সচিত্র।

রাজসংস্করণ মডেল-ভগিনী-উপন্যাস তের খানি ছবির সহিত প্রকাশিত হইল। কি কি ছবি আছে দেখুন ;—

(১) আলুলায়িত কেশে কমলিনী ইজি-চেয়ারে অধিষ্ঠিতা। (২) শিক্ষক নগেন্দ্রনাথকে কমলিনী করমর্দনপূর্ব্বক স্বগৃহে আহ্বান করিতেছেন। (৩) কমলিনীর স্বামী রাধাশ্যাম ভাগবতভূষণ কমলিনীর গৃহে আসিয়া যেমন তামাক খাইতে যাইবেন, অমনি চাটুর্জ্জি-সাহেবকে দেখিয়া তিনি হুঁকাটী মুখ হইতে দূরে ধরিলেন। (৪) রাত্রে রাজপথে কপিল খানসামা, বকাউল্লা খেসেড়া প্রভৃতি কর্ত্তৃক রাধাশ্যামের লাঞ্ছনা। (৫) ডেপুটী বাবুর দিব্যজ্ঞান হওয়ায়, নাপিত কামাইতে আসিলে, তাহাকে প্রেমালিঙ্গন করিতে উদ্যম। (৬) হুগলী ব্রাহ্মস্কুলের হেডমাষ্টার বারেশ্বর, কৈলাসকে হাতা মারিতে উদ্যত। (৭) বৈদ্যনাথের নন্দনপাহাড়ে সন্ন্যাসী নগেন্দ্র। (৮) কমলিনী মূর্চ্ছিত হইয়া নগেন্দ্রের কোলে মাথা তুলিয়া দিলেন। (৯) মথুরায় ভিখারীগণকে খাওয়াইবার জন্য রাধাশ্যামের রন্ধন। (১০) ব্রাহ্মণ রাধাশ্যামকে বেত্রাঘাত-উদ্যোগ। (১১) দক্ষিণে নগেন্দ্র, বামে মহেন্দ্র,—মধ্যস্থলে কমলিনী। (১২) গুণ্ডাগণ, ব্রাহ্মণের মুখ হাঁ করাইবার জন্য লৌহ-রুল দ্বারা মুখে আঘাত করিতেছে ;—কমলিনী মহামাংসের রস স্বামীর মুখে ঢালিতে উদ্যত হইয়াছেন। (১৩) কমলিনীর মুখে ও সর্ব্বাঙ্গে চাকা চাকা ঘায়ের

দাগ ;—এই অছিলে একদিন সে পলায়িত নগেন্দ্রনাথের চেন ধরিয়া পটলডাঙ্গার পথে টানাটানি করিতেছে।

রাজসংস্করণ মূল্য ১।/০ এক টাকা পাঁচ আনা। ডাঃ মাঃ ৶০ তিন আনা।

সুলভ সংস্করণ মূল্য ৷৵০ দশ আনা। ডাঃ মাঃ ৵০ দুই আনা। সুলভ সংস্করণে ছবি নাই।

ভিঃ পিতে লইলে ৵০ দুই আনা অধিক লাগে।

মডেল-ভগিনী অনন্তরসের আকর। এ সুধা একবার পান করিলে কেহ ভুলিতে পারিবেন না। ইহা সতীরমণীর একান্ত পাঠ্য। মডেল-ভগিনীতে অষ্টবজ্র আছে। চন্দ্রের সুবিমল সুধা, অগ্নির জলন্ত উত্তাপ, সূর্য্যের প্রখর কিরণ, বসন্তের মলয়-সমীরণ, হিমাসরের উচ্চশৃঙ্গ, মাধবী লতায় প্রিয়তম ভৃঙ্গ, ইন্দ্রের শ্রীমতী শচী, নরেন্দ্রের মিসেস পাঁচী—এ সমস্তই আছে। আর যিনি হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের নিগূঢ় মহিমা জানিতে চাহেন, তিনি মডেল-ভগিনী পাঠ করুন। যিনি বেদান্তদর্শনের সূক্ষ্ম তত্ত্ব অবগত হইতে চাহেন, তিনিও মডেল-ভগিনী পাঠ করুন।

জন্মভূমি।

মাসিকপত্র,—মাসে মাসে প্রকাশিত।

জন্মভূমির অগ্রিম বার্ষিক মূল্য এক টাকা দুই আনা, ডাক মাশুল ।৵০ ছয় আনা ; ভ্যালুপেবলে লইলে আরও দুই আনা অধিক লাগে। দশ-পয়সার টিকিট না পাঠাইলে, মফঃস্বলে একখণ্ড জন্মভূমি নমুনাস্বরূপ পাঠান হয় না। কলিকাতায় এক খণ্ড জন্মভূমির মূল্য সাত পয়সা।

প্রথম বৎসরের জন্মভূমি সম্পূর্ণ বারখণ্ড বিক্রয়ার্থে প্রস্তুত। ১ম বৎসরের জন্মভূমির মূল্য এক টাকা দুই আনা, ডাঃ মাঃ ছয় আনা। প্রথম বৎসরের জন্মভূমি ৭৩৪ পৃষ্ঠায় পূর্ণ, ইহাতে ৫১ খানি ছবি আছে।

দ্বিতীয় বৎসরের জন্মভূমি বারখণ্ড বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত। মূল্য এক টাকা দুই আনা ; ডাঃ মাঃ ছয় আনা। দ্বিতীয় বৎসরের জন্মভূমি ৭৭০ পৃষ্ঠায় পূর্ণ। ৪৫ খানি ছবি আছে।

ভ্যালুপেবলে লইলে দুই আনা অধিক লাগে।

সচিত্র বাঙ্গালা অক্ষর পরিচয়।

সুকুমার-মতি বালকদের নিমিত্ত বহুযত্নে এই অক্ষরপরিচয় প্রস্তুত হইল। অক্ষরগুলি বড় বড়; এবং প্রত্যেক অক্ষরের নীচে এক একটী ছবি আছে। ইহাতে অক্ষর চিনিবার বিশেষ সুবিধা ত হইবেই; ইহা ভিন্ন এই বড় বড় অক্ষর দেখিয়া ছেলেরা হাতের লেখা বেশ লিখিতে পারিবে। যে যে অক্ষরের নীচে যে যে ছবি আছে, তন্মধ্যে কয়েকটী নিম্নে লিখিত হইল;—

ক,—কৃষ্ণ; খ,—খরগোষ; গ,—গণেশ; ঘ,—ঘন্টা; চ,—চামর; ছ,—ছাতা; জ,—জগন্নাথ; ঝ,—ঝাড়; অ,—অসুর; আ,—আর্থ; ই,—ইন্দুর; ঈ,—ঈশান ইত্যাদিরূপ জানিবেন।

এই অক্ষরপরিচয়ের মূল্য যতদূর সম্ভব সুলভ করা হইল। মূল্য—

একপয়সা মাত্র।

মফঃস্বলে পাঠাইতে হইলে ডাকমাশুল দুই পয়সা লাগে। একত্রে আটখানি অক্ষরপরিচয় লইলে, দুই পয়সার ডাকমাশুলেই গিয়া থাকে।

PICTORIAL ENGLISH ALPHABET.

অর্থাৎ

সচিত্র ইংরেজী অক্ষর পরিচয়।

অতি সুন্দর, অতি মনোহর।

প্রত্যেক ইংরেজী অক্ষরের নীচে এক একখানি ছবি।

সস্তার চূড়ান্ত। প্রত্যেক সচিত্র-ইংরেজী-অক্ষর-পরিচয়ের মূল্য এক পয়সা, ডাঃ মাঃ দুই পয়সা। আটখানি "অক্ষর পরিচয়" দুই পয়সা ডাক মাশুলে যায়। (পাইকেরি বিক্রয়) এক শত অক্ষর পরিচয় লইলে, এক টাকাতেই পাইবেন। ডাঃ মাঃ ছয় আনা, ভিঃ পিঃ খরচ দুই আনা।

শ্রীদুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩৪।১ কলুটোলা, বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়, কলিকাতা।

বিজয়া বটিকা

পুরাতন জ্বরনাশের এরূপ উৎকৃষ্ট ঔষধ ভারতে এ পর্য্যন্ত আর আবি-
ষ্কৃত হয় নাই। সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ লোক এ ঔষধ সেবনে আরোগ্য
লাভ করিতেছেন। সামান্য সামান্য জ্বররোগ ত সহজেই আরাম হই-
তেছে,—যে সকল কঠিন পুরাতন জ্বর,—প্লীহা-যকৃৎ-সংযুক্ত জ্বর কোনও
ঔষধে আরাম হয় নাই,—ডাক্তার কবিরাজ যে রোগ বহুচেষ্টাতেও
আরোগ্য করিতে সক্ষম হন নাই, বিজয়া বটিকা সেবনে সে রোগ অল্প
দিনে আরাম হইতেছে। ভারতের যে পল্লীগ্রামে একবার এক কৌটা
ঔষধ যাইতেছে, সে গ্রামের অন্য সমস্ত রোগী অন্য চিকিৎসা বন্ধ করিয়া,
বিজয়া বটিকার পক্ষপাতী হইয়া, বিজয়া বটিকা পাইবার জন্য পত্র
লিখিতেছেন কুইনাইনে যে জ্বর বন্ধ হয় না, বিজয়া বটিকায় সে জ্বর সহ-
জেই বন্ধ হয়। নিয়মিতরূপে বিজয়া বটিকা সেবন করিলে, পুনঃপুনঃ জ্বর
আসিবার আর কোনও আশঙ্কা থাকে না। বঙ্গের ম্যালেরিয়া-জ্বর-প্রপী
রোগিগণ! যদি অন্য কোনরূপে এপর্য্যন্ত আপনারা আরোগ্যলাভ করিতে
না পারিয়া থাকেন, তবে বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ-ফল
দর্শন করুন। হে আসামবাসিগণ! কালাজ্বরে আর ভুগিতে হইবে না;
ঐ রোগাক্রান্ত শত শত ব্যক্তি বিজয়া বটিকা সেবনে এক্ষণে নীরোগদেহ
হইয়াছেন। চা-বাগান কুলিডিপো, নীলকরের কারখানা,—সর্ব্বত্র আজ
বিজয়া বটিকার প্রাদুর্ভাব। বিজয়া বটিকায় দরিদ্র-ধনীর সম অধিকার।
কুটীরবাসী কৃষক এবং মুকুটধারী রাজা—বিজয়া বটিকা সেবনে সমান
ফল লাভ করিয়া থাকেন। বিজয়া বটিকার শক্তি মন্ত্রশক্তিবৎ অদ্ভুত।
জলে যেমন আগুণ নিবিয়া যায়, বিজয়া বটিকায় জ্বরাদি সেইরূপ নির্ব্বা

শিত হয়। কি বালক কি বালিকা, কি স্ত্রী কি পুরুষ, কি ধনবান্ কি দরিদ্র—সকলেই স্বচ্ছন্দে সেবন করিতে পারেন।

বিজয়া বটিকার অধিকতর আশ্চর্য্য ক্ষমতা এই যে, ইহা সহজ শরীরেও সেবনীয়। কেবল সর্দ্দি-কাসি হইয়াছে, বিজয়া বটিকা সেবনে তাহা দূর হইবে। ঠাণ্ডা লাগিয়া গা-হাত-পা কামড়াইতেছে, কোমরে ব্যথা হইয়াছে, অতিরিক্ত পরিশ্রমে দেহ অবসন্ন হইয়াছে, বিজয়া বটিকা সেবনে সে রোগ দূর হইবে। মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, বৈকালে হাত-পা জ্বালা, চক্ষু জ্বালা, অক্ষুধা,—এ সকল রোগ বিজয়া বটিকায় আরোগ্য হয়। যথানিয়মে এই মহৌষধ সেবন করিলে, দেহের পুষ্টি লাভ হয়, বল-বীর্য্য বৃদ্ধি হয়, দেহের লাবণ্য বৃদ্ধি হয় এবং ধারণাশক্তি জন্মে। এদিকে আবার শোথরোগ, বহুকালীন জ্বর, পালা জ্বর, কম্প জ্বর, বিষম জ্বর, মেহঘটিত জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, প্লীহা-যকৃৎ-কাসিযুক্ত জ্বর—এ সমস্তই বিজয়া বটিকা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে। এরূপ ফলপ্রদ ঔষধ, প্রকারে এত অধিক গুণবিশিষ্ট ঔষধ, এ দেশে এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। পাঠক! একবার পরীক্ষা করিয়া দেখুন, হাতে হাতে শুভফল পাইবেন।

	বটিকার সংখ্যা	মূল্য	ডাঃমাঃ	প্যাকিং
১নং কৌটা	১৮	৸৵০	।০	৵০
২নং কৌটা	৩৬	১৷৵০	।০	৵০
৩নং কৌটা	৫৪	১৸৵০	।০	৶০

ভ্যালুপেবলে কৌটা লইলে, গ্রাহককে আরও দুই আনা অধিক দিতে হয়।

পাইকেরি বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা) লইলে কমিশন এক টাকা; অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা

পাইবেন। ডাক মাশুল ও প্যাকিং আট আনা মাত্র। (বার কৌটার কম লইলে কমিশন নাই।)

২নং এক ডজন লইলে কমিশন দেড় টাকা; অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার ডাঃমাঃ ও প্যাকিং বার আনা মাত্র।

৩নং এক ডজন লইলে কমিশন দুই টাকা; অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃমাঃ এক টাকা মাত্র।

ঔষধ পাইবার ঠিকানা।

এই ঔষধের উৎপত্তি স্থান—আদি স্থান,—বর্দ্ধমান জেলা সাহীপুর পোষ্টের অধীন বেড়ুগ্রামবাসী শ্রীরসিকচন্দ্র বসু কার্য্যাধ্যক্ষ নিকট প্রাপ্তব্য।

অথবা

কলিকাতা, ১২নং মৃজাপুর ষ্ট্রীটে, বি, বসু এণ্ড কোম্পানির নিকট প্রাপ্তব্য।